KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৫ সরকার্স মার্কেট স্ট্রীট, কল-২৭
Collection : KLMLGK	Publisher : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত
Title : বিভব (BIVAV)	Size : 5.5"/8.5"
Vol. & Number : 13/1 13/2 13/3 14/1	Year of Publication : Oct - Dec 1989 Jan - March 1989 July 1990 Feb 1991
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সংখ্যা ৪৭

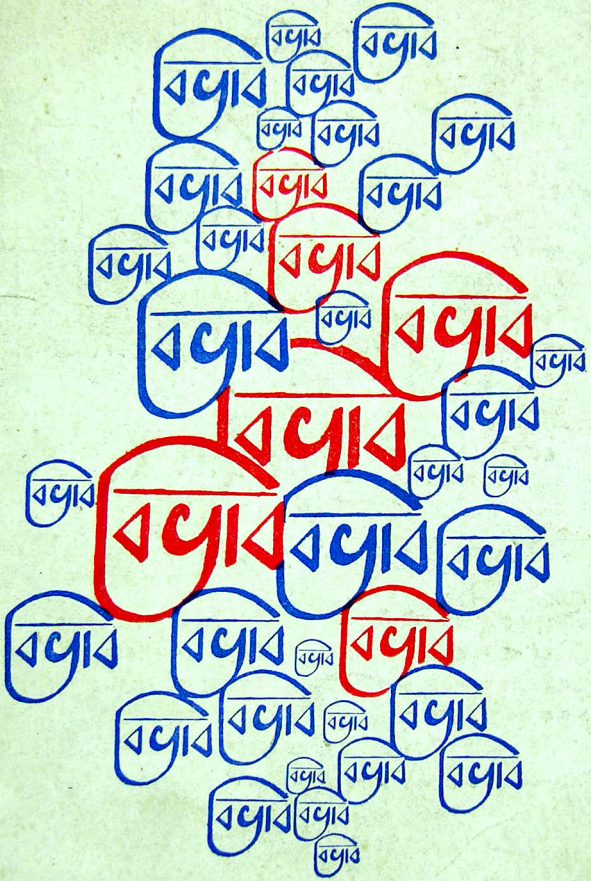

সম্পাদক / সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

আধুনিক ডিজাইন বলতেই

ত ন্তু জ

বাংলার তাঁতের কাপড়

আকর্ষণীয় রূপ, উজ্জ্বল রঙ, মসৃণ বুনন,
সঠিক পরিমাপ, ন্যায্য দাম

—আর সবার উপর—

নতুন নতুন চটকদার ডিজাইন

শাড়ী (সিল্ক, সুতি, ছাপা), ধুতি, বিছানার
চাদর-ঢাকা (সুতি ছাপা) এবং
গৃহসজ্জার সামগ্রী।

বিশেষ আকর্ষণ

পলিয়েস্টার, সার্টিং, স্যুটিং, সালোয়ার
কামিজ, ড্রেস মেটেরিয়ালস্

গামছা-টাওয়াল, জনতা শাড়ী (সুতি ও ছাপা)
জনতা ধুতি ও লুঙ্গী ইত্যাদি।
তন্তুজ বিক্রয় বিপণিতে পাওয়া যায়।

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স
কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ
৪৫, বিপ্লবী অনুকূলচন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭২

বিভাব

সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক ত্রৈমাসিক
বিশেষ শীত সংখ্যা ১৩৯৬
ত্রয়োদশ বর্ষ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচি

প্রবন্ধ

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্ক্সবাদের সংকট ১ সুধী প্রধান

সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ কতটা সমাজতান্ত্রিক ৩৩ অনিমেষ দস্তিদার

'টানাপোড়েন'—উপন্যাসের চিত্রকল্প অথবা চিত্রকল্পের টানাপোড়েন ৬৭ রবিন পাল

স্মৃতিচারণ

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় : বাঙালিমানসের এক অবিস্মরণীয় সেতুবন্ধ ১৪ পার্থ বসু

গল্প

নির্বাসন ২২ আবদুল মান্নাফ

মিউজিয়ামের পিস্তল ৪৩ কমল চক্রবর্তী

কবিতা

দুর্গা দত্তর কবিতা ৫৯ মল্লিনাথ গুপ্ত

ক্রোড়পত্র : পুরাতনী

ইংরাজ আগমনের পূর্ব ও পরে প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা ৮৫ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

কলিকাতার ভূতত্ত্ব ও পুরাকালের কথা ১১১ হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকমণ্ডলী

পবিত্র সরকার

দেবীপ্রসাদ মজুমদার। প্রদীপ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয় দপ্তর

6 সার্কাস মার্কেট প্লেস। কলিকাতা 17

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

অরূপ দত্ত

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত কর্তৃক 6 সার্কাস মার্কেট প্লেস, কলিকাতা 17 থেকে প্রকাশিত
ও টেক্‌নোপ্রিন্ট, 7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন, কলিকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

এই সংখ্যায় 'বিভাব' চোদ্দ বছরে পড়ল। কোনো সাহিত্যপত্রিকার পক্ষে এই পরমায়ু দীর্ঘই বলতে হবে! পাঠকের প্রবহমান উৎসাহ ও অভিনন্দন সত্ত্বেও সময়ের এই ব্যাপক পরিসরে গুণমানের নিরিখে এর প্রকাশ যে সবসময় একই রকম স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ছিল এমন বলা যাবে না। ভালো লেখা পাওয়া যেমন দুরূহ, স্বীকৃত যোগ্যতার লেখকদের দিয়ে সময়সীমার মধ্যে লিখিয়ে নেওয়া আরো শ্রমসাধ্য। নতুন প্রতিশ্রুতিময় লেখকদের জন্য বিভাবের দরজা আমরা সব সময় খোলা রেখেছি। কিন্তু তেমন সুবাতাস এলো কই! একমাত্র যথাসময়ে ভাল লেখা না পাওয়ার কারণেই একাধিকবার আমাদের বাধ্য হয়েই যুগ্ম সংখ্যা প্রকাশ করতে হয়েছে। এ ছাড়াও আরো নানারকম বিপর্যয়ে আমরা তাৎক্ষণিক ভাবে গ্রস্থ হয়েছি। তবু শেষ অবধি 'বিভাব' যে অনেকটাই নিয়মিত হয়ে উঠেছে তার জন্য লেখক, পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভার্থী, বিশেষ করে প্রেসের সহকর্মীদের কৃতিত্ব অনেকটাই।

জানিনা এর প্রকাশ কতকাল অব্যাহত থাকবে। পত্রিকাপ্রকাশের আনুষঙ্গিক খরচ ক্রমশই আমাদের সাধ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বিশেষত এ কাগজের বিগত তেরো বছরের অতিশ্রুত প্রকাশসৌষ্ঠব বজায় রেখে আরো কতদিন আমরা এর প্রকাশ বজায় রাখতে পারবো জানিনা।

কেন্দ্রে বহুপ্রার্থিত রাজনৈতিক পালাবদল ঘটায় আমরা খুবই আনন্দিত। তবে বহুদল-জোড় এই আনন্দ কতদিন স্থায়ী হবে সেই আশঙ্কা কিন্তু থেকেই যায়! পারিবারিক রাজনীতি ও অপশাসনের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ দ্বিতীয়বার যাদের পার্লামেণ্টে পাঠালো, তারা ব্যক্তিগত ও দলীয় স্বার্থের ওপরে উঠে এবার সত্যিকারের স্থায়ী মঙ্গলের দিকে যদি দেশকে এগিয়ে না নিয়ে যেতে পারেন তাহলে ইতিহাস তাদের ক্ষমা করবে না।

পূর্ব ইয়োরোপের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পালাবদল, বা তারো আগের চীনের ছাত্র আন্দোলনের ঘটনাবলী গভীরমনস্ক অনুধাবন ও আত্ম-অনুসন্ধানের দাবী রাখে। এই আত্মবিশ্লেষণের প্রয়োজনেই এ সংখ্যায় সুধী প্রধান ও অনিমেষ দস্তিদারের অত্যন্ত সময়োপযোগী দুটি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হলো। এই দুটি

রচনার সমস্ত বক্তব্যের সঙ্গেই যে আমরা একমত এমন বলা যাবে না। তবু এই লেখা দুটিকে কেন্দ্র করে একটি গঠনমূলক আলোচনার সূত্রপাত হলে আমরা খুশীই হবো। যে কোনো মতবাদই সংশোধনযোগ্য। জনসংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাধারণ মূল্যবোধের যে রূপান্তর প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, রাজনীতি তার বাইরের কোনো উচ্চাবচ বস্তু নয়। তাকে প্রয়োজনে দেশমানুষের যোগ্য করে নিতেই হয় এক সময়! নতুন আয়নায় পুরানো মুখ দেখা সবসময় খারাপ নয়।

এবারে সাহিত্য আকাদেমী পুরস্কার পেলেন শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। গত দু-দশকের অধিক সময় জুড়ে তাঁর রচনা আমাদের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে। তার এই সম্মানে আমরা গভীর উল্লসিত। শীর্ষেন্দুর দীর্ঘ সার্থক কলম-জীবন কামনা করি।

বিভাব সম্পাদকমণ্ডলী

ভ্রম সংশোধন :

আমাদের বিগত শারদীয় সংখ্যায় দু-একটি গুরুতর মুদ্রণ প্রমাদ থেকে গিয়েছিল। একটি বিশেষ ভুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পেছনের (Back Cover) কভারে Vol 12, No. 3 ছাপা হয়েছিল। হবে Vol. 12, No. 4.। সুতরাং এ সংখ্যা Vol. 13, No. 1

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে মার্ক্সবাদের সংকট

সুধী প্রধান

পূর্ব ইউরোপের সম্প্রতিকালের ঘটনাগুলি—বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক কয়েকটি দেশের সরকারে কমিউনিস্ট পার্টি সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া, পার্টির নাম পরিবর্তন করে শুধু সমাজতন্ত্রীদল হিসাবে পরিচয় দেওয়ার কথা এবং 'সাম্যবাদ আর চাই না' প্রভৃতি আওয়াজ গণসমাবেশে শোনা যাচ্ছে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচারযন্ত্রের সংবাদপত্রগুলি যেভাবে সংবাদ পরিবেশন করছে তাতে যাঁরা সাধারণত সংবাদপত্র পড়েই সিদ্ধান্ত করতে চান তাঁদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মার্ক্সবাদের নামে শপথ নিয়ে এই রাষ্ট্রগুলিতে যে রাজনৈতিক দল এই সমস্ত দেশ শাসন করছিল সেই দলগুলির দুর্বলতার মূল কারণ মার্ক্সবাদের অবাস্তবতা।

এইসব বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই জানা দরকার মার্ক্সবাদ কি। একটি সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধে তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করা সম্ভব নয়। মার্ক্সবাদ প্রয়োগের সর্বাপেক্ষা স্বীকৃত ব্যক্তি হচ্ছেন লেনিন। তাঁর হিসাব মতো মার্ক্সবাদ জার্মান দর্শন। বৃটেনের ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদদের ধ্যান-ধারণা এবং ফরাসি এনসাইক্লোপেডিস্টদের রচনাবলী থেকে মার্ক্স দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা, শ্রেণীসংঘর্ষ ও সর্বহারার একনায়কত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। শেষোক্ত চারটি বিষয়কে লেনিন মার্ক্সবাদের চারটি স্তম্ভ বলে-ছিলেন। সম্প্রতিকালে যে সমস্যাগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশে দেখা দিয়েছে তা প্রধানত সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব এবং সেই একনায়কত্ব শ্রমিকশ্রেণীর বা সর্বহারা শ্রেণীর পক্ষে যে পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি করছে—তার ক্রিয়াকলাপ মার্ক্সবর্ণিত মূল সাম্যবাদের সঙ্গে বিসদৃশ বলে নিন্দিত হচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয়

এই যে সমাজতন্ত্র কথাটা বাদ দেওয়ার ইচ্ছা এখনো সোচ্চার হয়নি। পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি পার্টির নাম কমউনিস্ট পার্টি ছিল না।

সুতরাং একথা বলা অযৌক্তিক হবে না যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ, ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা এবং শ্রেণীসংগ্রামের মার্ক্সীয় সিদ্ধান্তগুলি বর্তমান সংকটের সঙ্গে সম্পর্কহীন এবং সেগুলির বিরুদ্ধে কোনো মুখর প্রতিবাদ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে হয়নি—সোভিয়েট ইউনিয়ন বা প্রজাতান্ত্রিক চীনের তো কথাই নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বহারার একনায়কত্বের বদলে জনগণতন্ত্র বলে কথাটি সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে ব্যবহৃত হতে থাকে এটাও মনে রাখা দরকার।

যাই হোক, সত্তর বছর সোভিয়েট ইউনিয়নে এবং প্রায় চল্লিশ বছর চীন ও পূর্ব ইউরোপে কমিউনিস্ট পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকার পর বর্তমান পরিস্থিতি কেন হলো? কমিউনিস্টদের প্রতি সাধারণ মানুষ এত বিরূপ হলো কেন—সোভিয়েট ইউনিয়নে জাতিগত (ethnic riots) সংঘর্ষ কেন হ'ল—এই প্রশ্ন সর্বস্তরের মানুষের মনে জাগাই স্বাভাবিক। আমার থেকে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির খবর বিশেষজ্ঞের বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে অনুসরণ করেছেন—তাঁরা গঠনমূলক আলোচনা শুরু করলে বিষয়টি পরিষ্কার হতো। বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক শাখারভ মৃত্যুর আগে একটি মার্কিন সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাছে যেসব কথা বলেন তার থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি মার্ক্সবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের বিপক্ষে একটি কথাও বলেননি। তিনি বলেছেন—"সোভিয়েটকে সব ক্ষমতা দিতে হবে" —এই দায়িত্ব মন্ত্রীদপ্তরগুলি পালন না করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখেছিল। যার ফলে স্বয়ংশাসিত ও স্বাধীন শিল্পায়ন হয়নি এবং ভূমি ব্যবস্থার যথাযথ সংস্কার না করে কালেকটিভ ফার্মের পিছনে অর্থের অপব্যয় ঘটেছে। জাতি সংঘর্ষ এড়াবার জন্য শাখারভ সোভিয়েট ইউনিয়নের রাষ্ট্রের ফেডারাল কাঠামোকে সম্প্রসারণ করে কেন্দ্রের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র সম্পর্ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং আরো কিছু ক্ষমতা রাখার সুপারিশ করেছেন। অন্য সকল বিষয়ে স্বাধীনতা নিয়ে একটি চুক্তির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় শাসন গড়ার পরামর্শও তিনি দিয়েছেন। অ্যাটম বোমা নির্মাণের ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে তাঁর এই কাজে যোগ দেওয়ার আগে থেকেই সোভিয়েট ইউনিয়নে কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যাপারে তিনি যা করেছেন ঠিকই করেছেন কারণ তার ফলে দুনিয়াতে এই বিষয়ে দুইপক্ষের মধ্যে শক্তি সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আণবিক অস্ত্র সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে অনেক স্তর অতিক্রম

করতে হবে। বর্তমানে সোভিয়েট ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থা ব্রেজনেভের যুগ থেকেও খারাপ এবং তার জন্য দেশের মধ্যে চাপা অসন্তোষ ও নেতৃত্বের উপর জনগণের আস্থার সংকট দেখা দিয়েছে। এইসব কথা তিনি কংগ্রেসে বলেছেন। ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার একটি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কাছে শাখারভের মৃত্যুর আগে শেষ বক্তব্য হিসাবে পড়লে মনে হয় না তিনি মার্ক্সবাদ সম্পর্কে আদৌ হতাশ হয়েছেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন ধনতান্ত্রিক দেশ সমাজতান্ত্রিক হোক—এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক হোক তাহলে সকলেরই মঙ্গল হবে। বিশ্ব-বন্দিত বৈজ্ঞানিকের শেষ বক্তব্য থেকে আমরা যা পেলাম—তা হলো সমাজতান্ত্রিক দেশেও গণতান্ত্রিক বিকাশের সমস্যার কথা। ভারতে মিশ্র অর্থনীতি-ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থাতে, ইটালির ক্রিশ্চান সোশালিস্ট পরিচালিত রাষ্ট্রতেও এই ধরনের সংকটের কথা আমরা প্রায় প্রতিদিন শুনে আসছি। বস্তুত যে সকল দেশে কৃষক এবং বিভিন্ন ethnic group বর্তমান, সেখানেই এই ধরনের সংকট দেখা দিয়েছে।

সোভিয়েট ইউনিয়নে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিকতার প্রসার ৭০ বছরেও কেন হলো না—এর জবাব পেতে হলে একটু পিছনে তাকাতে হবে। মার্ক্সের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানির মতো উচ্চ শিল্পায়ন (highly industrialized) ওয়ালা দেশগুলিতে ঘটতে পারে। যন্ত্র যেমন কাজের মধ্যকার বৈষম্য দূর করবে, বুদ্ধিজীবী ও হাতেনাতে কাজ করার লোকের মধ্যকার পার্থক্য হ্রাস করবে, যন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত মানুষের জীবন-যাত্রার মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা ও পারস্পরিক নির্ভরতা বৃদ্ধি করবে—ফলে সমবেত প্রচেষ্টাতে সকলের ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে এবং তার ফলে যে উৎপাদন হবে—তার থেকে যে যার প্রয়োজন মেটাবে। From each according to his abiltiy to each according to his need—অবস্থাটা একটা আদর্শ অবস্থা যার জন্য শিল্পায়নের সঙ্গে সমাজের অধিকাংশ মানুষের মানসিক পরিবর্তন ও সমস্ত উৎপাদন-কে সামাজিক রূপ দিতে সক্ষম হবে। অর্থাৎ যান্ত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে একটা মানসিক পরিবর্তন এই আদর্শে পৌঁছবার পক্ষে প্রয়োজন। মার্ক্স তাই এঙ্গেলসকে শেষ বয়সে লিখেছিলেন ফরাসি দেশ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরু করবে এবং জার্মানিতে তা শেষ হবে। কারণ ফরাসী দেশের কয়েকটি বিপ্লব, স্বাধীনতা, সমানা-ধিকারবাদ ও সৌভ্রাতৃত্বের ধ্যান-ধারণাকে জনপ্রিয় করতে পেরেছে। মার্ক্সের

এই আশা পূর্ণ হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্রান্সে ও ইতালিতে সোশালিস্ট ও কম্যুনিস্টরা সরকারে কিছুদিন থাকলেও শেষপর্যন্ত ফ্রান্সের জগাখিচুড়ি সরকার মার্কিন মার্শাল প্ল্যানের টাকায় গঠিত হয়েছিল। ইতালিতেও সেই অবস্থা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরের অবস্থা নিয়ে পরে আলোচনা করতে হবে।

১৯১৭-১৮ সালে বলশেভিকরা যখন রুশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক সরকার গঠন করেন —তখনকার দিনের ইতিহাস, লেনিনের বক্তৃতা ও রচনা থেকে জানতে পারি—লেনিন বারবার বলছেন—রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ এবং পার্টি-বুর্জোয়ারা কৃষকদের পরেই জনসংখ্যার প্রভাবশালী বৃহদাংশ। ১৯১৮ সালের ১৯ জানুয়ারি গণপরিষদ ভেঙে দেবার প্রসঙ্গে লেনিন বলছেন : 'ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ দীর্ঘস্থায়ী ও তিক্ত সংগ্রামের সূচনা করবে।' জারতন্ত্র ধ্বংস করার পর রুশ বিপ্লব বুর্জোয়া বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে বাধ্য—কারণ যুদ্ধ জনগণের যে অপরিসীম দুর্দশা সৃষ্টি করেছে তার জন্য সামাজিক বিপ্লবের মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে—

"Nothing therefore is more ludicrous than the assertion that the subsequent development of the revolution and the revolt of the masses that followed, were caused by a party, by an individual, or, as they vociferate, by the will of a 'dictator'. The fire of the revolution broke out solely because of the incredible suffering of Russia and because of the conditions created by the war." যার জন্য শ্রমরত জনগণকে, অনাহারে মৃত্যু-বরণের পরিবর্তে প্রবল, বেপরোয়া ও নির্ভীক পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য করে। আর সেই পন্থা হচ্ছে—শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক কর্তৃক সোভিয়েট গঠনের দ্বারা ক্ষমতা দখল—যার কোনো দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে অনুষ্ঠিত কোনো বিপ্লবের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। লেনিন এই ব্যাপারে প্যারিস কম্যুনের তুলনা করে তার ব্যর্থতার কারণগুলি তুলে ধরেছেন। লেনিনের মতে প্রধান কারণ হচ্ছে ফ্রান্সের অধিকাংশ কৃষক এই প্যারিস কম্যুনের সংবাদ ও তাৎপর্য জানত না। লেনিন তারপর বলেছেন যে রাশিয়াতে যে বিপ্লব ঘটল —তা বিশ্ব বিপ্লবের একাংশ এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। রুশ বিপ্লবের শুরুতেই বলশেভিক পার্টির একাংশ—জিনোভিয়েভ, কামেনেভ প্রভৃতির নেতৃত্বে একদেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব করার বিপক্ষে উপদল গড়ছিল। লেনিন তাদের মতামত খণ্ডন করার জন্য ইউরোপের অন্যান্য দেশে

বিশেষ করে জার্মানিতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। 'তৃতীয় বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং ইতিহাসে তার স্থান' বিষয়ক প্রবন্ধে লেনিন আশা প্রকাশ করেছিলেন জারতন্ত্রের পশ্চাৎপদ ও দুর্বল অবস্থাতে রাশিয়াতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটলেও বিশ্ববিপ্লবের নেতৃত্ব পশ্চিম ইউরোপের সর্বহারাদের উপর বর্তাবে এবং তৃতীয় বা কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সদর দপ্তর পশ্চিম ইউরোপে চলে যাবে। রুশ বিপ্লবের পর সরকার গঠনের সময় লেনিন বারবার বামপন্থী সোশালিস্ট রেভলিউশনারীদের (এই দলের রাশিয়ার কৃষক আন্দোলনের উপর প্রভাব ছিল) যোগদানের জন্য আহ্বান জানিয়েও তাদের সমর্থন পাননি। এই কারণে হাঙ্গেরীতে বেলাকুনের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হলে লেনিন এক পত্রে জানিয়েছিলেন যে সকল মতের সমাজতন্ত্রীদের ঐক্যবদ্ধ করে হাঙ্গেরীতে সরকার গঠন করে হাঙ্গেরী রুশবিপ্লবের তুলনায় অধিকতর উন্নতির পরিচয় দিয়েছে। কৃষকপ্রধান হাঙ্গেরীতে শেষপর্যন্ত এই সরকার অল্পদিনের মধ্যে ভেঙে যায়। এই দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় পশ্চিম ইউরোপের শিল্প কারখানায় উন্নত দেশগুলির সর্বহারারা বিপ্লব করে রুশিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি কৃষিপ্রধান দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে রক্ষা করবে—এই ধারণা লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির বৃহদাংশই বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁদের সে আশা পূর্ণ হয়নি—কারণ লেনিনের মতে উপনিবেশ দখলদার দেশগুলির ধনতান্ত্রিকরা নিজ দেশের শ্রমিকশ্রেণীর একাংশকে বেশি অর্থ দিয়ে বশে রাখতে পারে এবং এইভাবে যে পেটি-বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়—তারা বিপ্লব ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 'মধ্যস্থতা' buffer-এর কাজ করে।

কাজেই রাশিয়ার মতো প্রধানত কৃষক এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী অধ্যুষিত দেশে—বিশ্ববিপ্লবের সাহায্যহীন অবস্থায় সারা দুনিয়ার ধনতান্ত্রিক শক্রতার বেড়াজালের মধ্যে 'এক দেশের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অভীব দুরূহ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছে। যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হলো এই যে বৃটেন ফ্রান্স ও জার্মানিকে বাদ দিলে পূর্ব ইউরোপের সব দেশই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রধানত কৃষিপ্রধান দেশ ছিল এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামান্যই অগ্রগতি ঘটে। লেনিনের মৃত্যুর আগে অর্থাৎ ১৯২৩ সাল পর্যন্ত তাঁর রচনা ও চিঠিপত্র থেকে আমরা জানতে পারি স্বদেশে কৃষকসমস্যা এবং জাতিসমস্যা এবং স্বদেশী প্রতিক্রিয়াবাদীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে 'নয়া অর্থনীতি' দ্বারা নির্দিষ্ট সময় ও বাজারের

এলাকার মধ্যে স্বাধীন ক্রিয়াকলাপ করতে দিয়ে এবং বিদেশে রপ্তানি আমদানির উপর রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ক্ষমতা বজায় রাখা, কৃষিতে অনাবৃষ্টির ক্ষতি দূর করা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে পার্টির অভ্যন্তরীণ সমস্যা নিয়ে লেনিন তাঁর জীবনের শেষ দিকে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। লেনিনের চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি যাদের এক সময়ে পার্টি থেকে বার করে দেওয়ার প্রস্তাব তুলেছেন—তারা তাদের ভুল স্বীকার করলে তিনি তাঁদের অত্যন্ত দায়িত্বশীল পদে বসাতেও দেরী করতেন না। ট্রট্স্কি জিনোভিয়েভ, কামেনেভের সম্পর্কে তিনি রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্বে অনেক কঠোর কথা বলেছেন—কিন্তু শেষের দিকে দেখতে পাওয়া যায় (ব্যক্তিগত কারণে নয়) জাতিসমস্যা সম্পর্কেও তিনি স্টালিনের উপর আস্থা হারিয়েছেন। মোট কথা বিশ্ববিপ্লবের অনুপস্থিতিতে একটি কৃষকপ্রধান, বহুজাতি অধ্যুষিত দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করার সমস্যা বজায় রেখে লেনিন মারা যান।

লেনিন বেঁচে থাকতেই ইতালিতে ফ্যাশিস্ট দল কমিউনিস্ট বিরোধী হামলা শুরু করেছিল এবং ইটালিস্থ সোভিয়েট বাণিজ্যকেন্দ্র আক্রমণ করে একজন সোভিয়েট নাগরিককে হত্যা করে। জার্মানিতে নাজীবাদের ক্ষমতা দখল অল্প কয়েক বছরের মধ্যে ঘটে। পশ্চিম ইউরোপে সর্বহারা বিপ্লব ঘটার পরিবর্তে সমাজতন্ত্রবাদের বুলি নিয়ে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সাম্রাজ্যবাদের দ্বিতীয় বাহিনী হিসাবে একদিকে যেমন পশ্চিম ইউরোপের শ্রমিক আন্দোলনকে দুর্বল করতে থাকে—অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়নে গঠনমূলক কাজ অপেক্ষা দেশ-রক্ষার কাজ অগ্রাধিকার পেতে থাকে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই স্টালিনের যৌথখামার বা কালেকটিভ কৃষি-কাজের বিচার করতে হবে। মাও জে দঙের কম্যুন ব্যবস্থা এবং স্টালিনের কৃষি সম্পর্কিত ব্যবস্থা সমালোচিত হচ্ছে বটে—কিন্তু এই দুটি ব্যবস্থাই অবলম্বিত হয়েছে দ্রুত খাদ্য সমস্যার সমাধান করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কাজ অগ্রসর করার উদ্দেশ্যে—জমিদার বা বৃহৎ জমির মালিকদের কাছে জমি ফেরত দিয়ে নয়। লেনিনের মৃত্যুর ১৫ বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আপ্রাণ চেষ্টা করছে—হিটলারের আগ্রাসী আক্রমণকে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শুরু করাতে। আজকাল 'মস্কো বিচার'—যার দ্বারা স্টালিন তার বিরুদ্ধবাদীদের হত্যা করেছে বলে অভিযুক্ত হচ্ছেন—তার সম্পর্কে ঘোরতর কমিউনিস্ট বিরোধী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা চার্চিল তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থে লিখেছেন যে তাদের গুপ্তচররা সংবাদ দিয়েছিল

মস্কোতে প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্রের কথা। সম্প্রতি বিদেশে ত্রিশ দশকের অক্ষশক্তির দলিল অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমার নজরে এসেছে যে ফ্যাশিস্ট ইতালি ও নাজী জার্মানি ১৯৩২-৩৫ সাল থেকে আফগানিস্থানের উত্তর সীমান্ত থেকে বাল্টিক অঞ্চল পর্যন্ত কতগুলি অঞ্চলে জাতিগত প্রশ্ন তুলে সোভিয়েট সরকারের বিরুদ্ধে লোক খেপাচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় বর্তমানে যারা সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইছে—তারা এই সব এলাকার লোক। একটি কৃষিপ্রধান এবং বহুজাতি অধ্যুষিত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকে সাম্রাজ্যবাদী ধনতান্ত্রিক শক্তি প্রথমে প্রকাশ্যে পরে গোপনে সশস্ত্র ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজ এবং ফ্যাশিস্ট ও নাজী বাহিনীর আক্রমণের আশংকা (যা শেষ পর্যন্ত কার্য্যকরী হয়েছিল) সৃষ্টি করে—পুঁজিবাদী সভ্যতার পরিবর্তে নতুন সভ্যতা ও সমাজ সৃষ্টি কাজকে নির্দিষ্ট পথে চলতে দেয়নি—বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করার সময় সে কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে।

রাশিয়ার শ্রমিক আন্দোলন ও বলশেভিক পার্টির ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিবহাল মাত্রই জানেন—প্রবল মতবিরোধিতার মধ্যে লেনিনের দূরদর্শিতা, বিচক্ষণতা ও মানবিক গুণের জন্য বলশেভিকরা ক্ষমতা দখল করে। স্টালিন লেনিনের পক্ষের লোক ছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর আগে লেনিন যে বক্তব্য রাখেন—তাতে দেখা যায় স্টালিন সম্পর্কে তাঁর আস্থা হ্রাস পেয়েছে। তবু লেনিনের মৃত্যুর পর স্টালিন যে নেতা হতে পেরেছিলেন—তাতে সেই যুগের পার্টির অধিকাংশের মত ছিল। কৃষক সমস্যা এবং এক দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বামপন্থী সোশালিস্ট বিপ্লবীদের ও বামপন্থী কমিউনিস্টদের মতবাদের সঙ্গে লেনিনের বিরোধ যে প্রবল হয়েছিল—তা লেনিনের লেখা থেকে জানা যায়। লেনিন যেভাবে এই বিরোধিতার সম্মুখীন হন—স্টালিনের পক্ষে তা হয়নি—কারণ স্টালিন লেনিন নন। দ্বিতীয়ত আসন্ন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বলশেভিক পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিকতা হ্রাস পেতে শুরু করে।

এই প্রসঙ্গে পার্টির composition—অর্থাৎ জনগণের মধ্য থেকে যাদের পার্টি সদস্য করা হবে—তাদের কথা ভাবা দরকার। বিপ্লবের আগে কারা সদস্য হয়েছিল—এবং পরে কারা হয়েছে—তার হিসাব করা দরকার। জারের অত্যাচারের মধ্যে বে-আইনী পার্টিতে যারা এসেছিলেন—তারা পশ্চিম রুশিয়ার কলকারখানা, ছোট ছোট শহর এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি থেকে। এদের মধ্যে স্টালিনের

মতো নিচুতলার মানুষের সঙ্গে লেনিনের মতো উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ক্রুপস্কায়ার মতো শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। বলশেভিক পার্টি রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে গৃহযুদ্ধে জয়লাভ করে যে আইনসঙ্গত পার্টি রূপে আত্মপ্রকাশ করল—তাতে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী—যাদের সুবিধাবাদী চরিত্রের কথা মার্ক্স থেকে লেনিন বারবার বলেছেন—তারা পার্টির মধ্যে নিশ্চয় ভিড় করেছে। আমরা পঃ বঙ্গে বামফ্রন্টের বিপ্লবী দলগুলির বর্তমান সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাস খতিয়ে দেখলে বুঝতে পারব ত্রিশ বছর ধরে যারা কংগ্রেসের পক্ষে কাজ করেছে তারা অবস্থা বুঝে বিভিন্ন বামপন্থী দলে এমন ভাবে ঢুকেছে—যে অনেক পুরানো বামপন্থী কোণঠাসা বোধ করছেন। ব্যাপারটি কেবল প্রকাশ্য নয়—অনেক ক্ষেত্রে লজ্জাজনক। সোভিয়েট ইউনিয়নে অন্যরকম আশা করব কেন? তারপর কৃষক সমাজ থেকে যারা বলশেভিক পার্টিতে আইনীযুগে এসেছে—তারাও যুগ যুগ ধরে পাওয়া সংস্কার নিয়ে এসেছে—যার থেকে উদ্ধার পেতে মাও জে দঙের মতে শত শত বৎসর লেগে যেতে পারে। আমি আগেই বলেছি—কলকারখানায় নিযুক্ত সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে গ্রামের কৃষিজীবী মানুষের স্বভাব চরিত্র পৃথক। তাছাড়া সোভিয়েট ইউনিয়নে বিপ্লবের পরে কলকারখানাতে যারা শ্রমিক হয়ে এসেছে—তারাও এই কৃষক শ্রেণী থেকে এসেছে। ভারতবর্ষের মতো কৃষিপ্রধান দেশে যারা শ্রমিক হয়ে শিল্পাঞ্চলে আসছে—তাদের সঙ্গে তাদের গ্রামের সম্পর্ক, তাদের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক—যা তারা শহর, কারখানার বস্তি ও খনি অঞ্চলের বাসস্থান পর্যন্ত রক্ষা করতে চেষ্টা করে—তার থেকে আমরা অনুমান করতে পারি—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নে পার্টি গঠনে কারা ক্রমান্বয়ে সংখ্যাধিক হচ্ছিল। অবশ্য বলা হতে পারে যে শিক্ষা ব্যবস্থায় এবং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় নতুনত্ব আনার যে চেষ্টা শুরু থেকেই হচ্ছিল—তার প্রভাব নিশ্চয় ছিল। তা না হলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই সোভিয়েট তন্ত্র জারতন্ত্রের মতো ভেঙে পড়ত। অবশ্য স্টালিন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে—সোভিয়েট ইউনিয়নের যোগদানকে দেশপ্রেমিক যুদ্ধ বলে ঘোষণা করেছেন। হিটলার বাহিনীর অত্যাচার এবং নৃশংস ভাবে ইহুদী নিধন নিশ্চয় দেশপ্রেমিক রাশিয়ানদের দেশরক্ষার লড়াইয়ে লড়তে উদ্বুদ্ধ করেছে। বহুজাতি অধ্যুষিত ভারতেও আমরা দেখেছি—চীনের সঙ্গে সীমানা সংঘর্ষে ও পাকিস্তানের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের 'দেশপ্রেম' কংগ্রেস বিরোধিতাকে সাময়িকভাবে ভুলিয়ে

দিয়েছিল। কিন্তু হিটলারের প্রথম দিককার আক্রমণে রুশিয়া যেভাবে পিছু হটছিল এবং হিটলার বাহিনী মস্কোর সীমানায় পৌঁছেছিল তখন স্টালিন বিরোধীরা সত্যই প্রবল থাকলে—তাকে হটিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তেমন কিছু না হওয়াতে প্রমাণ হয় যে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেবল জারের ব্যবস্থা থেকে উন্নত নয়—হিটলার-জার্মানির ব্যবস্থা থেকেও উন্নত। লক্ষ্য করার বিষয় আমেরিকা ও বৃটেন রুশিয়াকে সমরোপকরণই দিয়েছে—কিন্তু দ্বিতীয় ফ্রন্ট তখনি খুলেছে—যখন জার্মান নাজী বাহিনীর গতি সোভিয়েট ইউনিয়ন রুদ্ধ করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা এই জন্য স্মরণ করতে হবে যে ঐ যুদ্ধে রুশিয়ার মানুষ যত মরেছে, রাস্তাঘাট, ঘর বাড়ি, বাঁধ ও প্রযুক্তিবিদ্যার নানা কলকারখানা যত ধ্বংস হয়েছে তা অন্য কোনো দেশে হয়নি। বরং আমেরিকা মূল ভূখণ্ডে যুদ্ধ না হওয়ায় যুদ্ধ ব্যবসায়ে আমেরিকা প্রভূত পরিমাণে মুনাফা অর্জন করেছে।

প্রযুক্তি বিদ্যায় আমেরিকা যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছে তা এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফল। জাপানে অ্যাটম বোমা ফেলে আমেরিকা যে যুগ সূচনা করল—তার ফলে রণক্লান্ত ও বিধ্বস্ত সোভিয়েট ইউনিয়নকে পুনর্নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে আনবিক অস্ত্র নির্মাণের বিরাট ব্যয়ে প্রবৃত্ত হতে হলো। এইসব কাজ করতে গেলে অন্যদিকে পিছিয়ে পড়তেই হয়। আমি ১৯৮৫ সালে মস্কো ফিল্ম স্টুডিওতে গিয়ে দেখেছি বহু পুরানো ফিল্ম ক্যামেরা ওখানে ব্যবহৃত হচ্ছে যা হয় তো আমাদের দেশেও আজ আর ব্যবহৃত হয় না।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা তিনটি শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে। প্রথমত স্টীম ইঞ্জিন, দ্বিতীয় বিদ্যুৎ এবং রাসায়নিক এবং তৃতীয় মহাজাগতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে কমপিউটার প্রবর্তন। ৬০ দশকে শেষোক্ত বিপ্লবের ফলে ধনতন্ত্রবাদ নতুন করে তার প্রভুত্ব বিস্তার করার সুযোগ পেয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাম্রাজ্যবাদ আঘাত পেয়ে পিছু হটলেও মালটি-ন্যাশনাল সংস্থাগুলির মধ্য দিয়ে নয়া কায়দায় সাম্রাজ্যবাদ তার শোষণ চালাতে পারছে। কারণ আমাদের ভারতের মতো উন্নতিশীল এবং আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকায় অনুন্নত অথচ স্বাধীন দেশগুলির সরকারে যারা আছে—তারা তাদের নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়া বা উচ্চবিত্তশ্রেণীর লোক। এরা অধিকাংশই সমাজতন্ত্রবাদের বিপক্ষে; এদের জোটনিরপেক্ষতা হ'ল নিজেদের শ্রেণী স্বার্থে দুই পক্ষ থেকে সুবিধা আদায় করা। আমাদের 'সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের' পাবলিক সেকটার এবং প্রাইভেট সেকটারের কাজকর্ম দেখে আমরা ধারণা করতে পারি

প্রযুক্তিবিদ্যায় দুর্বল, কৃষি ও বহুজাতিভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে যে পার্টি রাজ্য চালাচ্ছে—তা যদি দুর্বল হয়—তাহলে আমলাতন্ত্রের আত্মম্ভরিতা, উপর থেকে সিদ্ধান্ত চাপানোর প্রবণতা এবং স্বজনপোষণ (নিজ গোষ্ঠী বৃদ্ধি করার জন্য) প্রভৃতি অ-কমিউনিস্টসুলভ লক্ষণগুলি বৃদ্ধি পেতে থাকে।

কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কেমন হবেন তার নির্দেশ লেনিন, স্টালিন ও মাও জে দঙ ও লিউ শাও চি প্রভৃতি লিখে গেছেন। পার্টির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পেলে বৈধ পার্টিতে নিজ গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সদস্য ঢোকানো খুব অসুবিধাজনক নয়। স্টালিনের মৃত্যুর পর ক্রুশ্চভ যখন স্টালিনের 'অপকর্মগুলির' ফিরিস্তি দিলেন এবং বললেন স্টালিনের হাতে মৃত্যুর ভয়ে তারা স্টালিনের জীবিতকালে স্টালিনের বিরোধিতা করতে পারেননি—তখন তিনি যে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মুখে কালি মাখিয়ে দিলেন—সেকথা একবারও ভাবলেন না। এই পার্টিই না জারের অকথ্য অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করেছে বলে আজো গর্ব করে!

স্টালিনের মৃত্যুর পর প্রথম স্টালিনকে নিয়ে, পরে জমি-জমা এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনা কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ সারা দুনিয়ায় যে চেহারা নিল—পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিতে ভাঙন ধরল। ফলে দুইটি প্রধান সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এমন সব কাজ করেছে যা লেনিন তো পরের কথা স্টালিনও করেননি। আমাদের দেশ থেকে আমরা দেখেছি সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা সমর্থন করেছে, অপর পক্ষে চীন সাম্রাজ্যবাদের মদৎ পুষ্ট পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে এবং আমেরিকার কমিউনিস্ট বিরোধী চক্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। আমেরিকা তার ফসল তিয়েন আমেন স্কোয়ারে সুদে আসলে আদায় করে নিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পূর্ব বার্লিন থেকে উত্তর কোরিয়া পর্যন্ত যে বিশাল এলাকা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এসেছিল—তার জনসংখ্যার অধিকাংশই কৃষিজীবী বিচিত্র জনগোষ্ঠী পূর্ণ—যাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়ত পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি—সোভিয়েট ইউনিয়নের সশস্ত্র বাহিনীর সাহায্যে ক্ষমতা পেয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদীরা যে 'শীতল যুদ্ধের' নীতি গ্রহণ করে তাতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সোভিয়েট ইউনিয়ন এই সকল দেশে সৈন্য রাখার প্রয়োজন বোধ করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আশংকা মোটেই অমূলক নয়। আমরা যারা কয়েকবার পশ্চিম জার্মানি গেছি, তারা জানি অনেক বয়স্ক লোক এখনো হিটলারের নিন্দা সহ্য করতে পারে না, যুবকদের একাংশ হিটলারের দার্শনিক নীটশের বই পড়ছে। সুখের বিষয় পূর্ব জার্মানিতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু লোকের পশ্চিম জার্মানিতে আশ্রয় নেবার উৎসাহ কমে গেছে এবং উভয় জার্মানির এক হওয়া তাদের পছন্দ নয়। যে কথা বলছিলাম—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধেনি বটে কিন্তু আঞ্চলিক যুদ্ধ—কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইরাক-ইরান ছাড়া অসংখ্য যুদ্ধ হয়েছে ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির বাইরে। এবং তারা যুদ্ধরত দেশে অস্ত্র বিক্রি করে, মৃত্যুব্যবসা থেকে মুনাফা করে। পঞ্চাশ দশকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রকাশ্য ঘোষণা ছিল এশিয়ার লোকদের নিজেদের মধ্যে লড়াই বাধাও। তাই কোরিয়া, ভিয়েতনাম ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ই কেবল নয়—ভারতের রাজ্যে রাজ্যে আধুনিক অস্ত্র নিয়ে ভারতবাসী পরস্পরকে হত্যা করছে।

এই বাতাবরণ মনে রাখলে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সংকট বুঝতে সুবিধা হবে। সর্বহারার একনায়কত্ব এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সম্পর্কে একটি গভীর নৈতিক দিক আছে। সামাজিক অবস্থা ও চেতনার বিভিন্ন স্তর থেকে যে মানুষ পার্টির সদস্য হয়—সে একটি কার্ড পেলেই কমিউনিস্ট হয় না। আজকাল 'তৃণমূলে' কাজ করার কথা খুব শোনা যায়। লেনিন এই কথাগুলি ১৯১৭-১৮ সালে বলেছেন এবং জনগণের উদ্যোগ বৃদ্ধি করে তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে বলেছেন। All power to the Soviet People-এর মর্মই হচ্ছে তাই—যাকে বৈজ্ঞানিক শাখারভও নতুন করে বলেছেন। সর্বহারার একনায়কত্বের তত্ত্বের সঙ্গে পার্টিগঠনও লেনিনের কীর্তি। যারা অধিকাংশই নিরক্ষর, সামান্য অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন শ্রমিক ও কৃষক। অনুন্নত সংগ্রামী মানুষকে মার্ক্সবাদী পার্টিতে আনা এবং তাদের চেতনার স্তর উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আগত কমিউনিস্টদের চেতনার স্তরে তোলা যে কত কঠিন—তা আমরা ভারতের কমিউনিস্টধারী পার্টিগুলির সভ্যদের মধ্যে শ্রমিক ও কৃষক সদস্যরা অত্যন্ত কম সংখ্যা থেকে দেখেছি। ইউরোপ, রুশিয়া বা চীনের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ হবে কেন? তাদের অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা বেশি বলে? এই নিয়ে সুইডেনের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যানের সঙ্গে আমার স্টকহলমে আলাপ হয়েছিল। তিনি বললেন: 'আমাদের পশ্চিম ইউরোপে মার্ক্স বর্ণিত সর্বহারা আর নেই, যদিও শ্রমজীবী আছে।

কিন্তু তারা বিশেষ বিশেষ কাজের শিক্ষা পায়—যার জন্য সম্পূর্ণ মানুষ হতে পারে না।' তিনি এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে 'পিপল্‌স ইউনিভার্সিটি' চালু করার পরিকল্পনা শোনান। আমাদের দেশে ১৯৪৩-৪৪ সালে অবিভক্ত পার্টির অন্ধ্রশাখা একবার এই চেষ্টা করেছিল। যাই হোক আমার বক্তব্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটিতে গণতন্ত্র থাকলেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা শেষ পর্যন্ত নিচু তলার বাস্তব অবস্থা ও চিন্তাভাবনার সমীকরণ না হয়ে উপর তলার অল্পসংখ্যক লোকের নির্দেশে পরিণত হয়। বিপদের পরিস্থিতি, আক্রমণের পরিস্থিতি ও যুদ্ধের পরিস্থিতি বজায় থাকলে পার্টিগণতন্ত্রের সাময়িক অবসান সদস্যরা সহ্য করে। সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সোভিয়েট ইউনিয়ন কর্তৃক আণবিক অস্ত্র হ্রাসের পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল পূর্ব ইউরোপে গণতন্ত্রের পক্ষে বেশ কিছু মানুষ সচল হয়েছে। এতে মার্ক্সবাদের অসারতা প্রমাণ হয়নি—বরং কঠোর সমালোচনার যোগ্য পদ্ধতিতে এই গণতান্ত্রিক বিকাশের পথ লেনিনের প্রতিষ্ঠিত পার্টিই দেখিয়েছে, একথা মনে রাখা দরকার।

মার্ক্সবাদ পুঁজিপতি ও তাদের প্রচারক বুদ্ধিজীবীদের Survival of the fittest তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব এবং এই কারণেই জনগণের বিরাট অংশের কাছে প্রিয় হতে বাধ্য যদি মার্ক্সবাদী পার্টি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে রেখে জনগণের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হতে পারে। তত্ত্বজ্ঞদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ ঘটানোর যে প্রক্রিয়া (mediation) তা যেমন অবশ্য প্রয়োজনীয় তেমনি বিপদও সেইখানে। কিন্তু বিষয়টি বিশ্বজনীন পরিস্থিতির সঙ্গে সম্পর্কিত। আমরা যারা নিউইয়র্ক, প্যারিস ও লণ্ডনে বেকার ও ভিখারী দেখেছি। এই সমস্ত শহরের পার্কে, স্টেশনে জনসাধারণের সুগম্য স্থানে নানাবিধ নোংরামি দেখে এসেছি তাই তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশগুলির সমালোচনায় প্রভাবান্বিত হইনি। কিন্তু তার জন্য সমাজতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্টদের গুরুতর ত্রুটির ক্ষমা নেই। আমাদের দেশের কমিউনিস্টরা এই সকল ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবে আমরা এই আশা করব। কারণ পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি ক্ষুদ্র অংশ এবং ভারতে প্রতিক্রিয়ার শক্তি প্রবল হলে কি হয় তা সত্তর দশকের অভিজ্ঞতা থেকে যেন শিক্ষা লাভ করতে পারি।

সংযোজন

ইতিমধ্যে যে-সব সংবাদ আমাদের দেশের ও অন্যান্য দেশের পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে—তা থেকে জানা যায় যে রুমানিয়াতে যে রক্তক্ষয়ী পরিবর্তন ঘটল তার অন্যতম শিকড়সন্ধানী কারণ খুঁজলে আমাদের সেই চমেস্কুর কাছেই কিন্তু ফিরে যেতে হবে। চমেস্কু একটি কৃষিপ্রধান দেশের দ্রুত শিল্পায়ন করতে প্রয়োজনীয় যে সমস্ত ব্যবস্থার সুপারিশ করেছিলেন তাতে জনসাধারণের দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের অভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল। পূর্ব ইউরোপের অন্য কয়েকটি দেশের তুলনায় অতি সম্প্রতি রুমানিয়াতে জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হলো, তাতে সেনাবাহিনীতে চমেস্কুর সমর্থক সংখ্যা কিন্তু কম ছিল না! অবশ্য এই পরিবর্তনে রোমান ক্যাথলিক গীর্জার পুরোহিতের ভূমিকাও লক্ষণীয়। কৃষি-প্রধান দেশে ধর্ম অধিকাংশ ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণাকে বজায় রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রুমানিয়া অক্ষশক্তির মিত্র হিসাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিপক্ষে লড়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' শুরু করায় পূর্ব ইউরোপের যে সমস্ত দেশকে সোভিয়েট ইউনিয়ন নাজীদের হাত থেকে কেড়ে নিতে পেরেছিল—সেইসব দেশে সোভিয়েট ইউনিয়ন তাদের মিত্র গোষ্ঠী অর্থাৎ ছোট ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপের উপর রাজ্যশাসনের ভার দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিল আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই। "সুটকেসে বিপ্লব চালান দেওয়া যায় না"—এই তথ্যের পরিবর্তে সশস্ত্র বাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণে বিপ্লব করার চেষ্টা করা হয়েছিল। লক্ষ্য করার বিষয় রুমানিয়ার কমিউনিস্ট নেতৃত্ব আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট দ্বন্দ্বে কিন্তু সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে ছিল না—অনেক ব্যাপারেই যুগোশ্লাভিয়ার মতো স্বতন্ত্র পথে চলত। মোটের ওপর কৃষিপ্রধান দেশ, বা বহু নৃগোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশের ধনতান্ত্রিক প্রতিরোধে সদাসর্ব্বদা (কখনো প্রকাশ্যে, কখনো বা গোপনে) বিপন্ন দেশের নেতৃত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক বিরোধে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তৃতীয় বিশ্বের ও অনুন্নত দেশগুলির ওপরে টেকনোলজির শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই—সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াতে সংকট সৃষ্টি করেছে। পূর্ব ইউরোপের অবস্থা—এক ধরনের ইউরো-কমিউনিজমের পক্ষে গিয়েছিল। কারণ পূর্ব জার্মানির সোশিয়ালিস্ট ইউনিটি সেন্টার থেকে প্রকাশিত পত্রিকার ওপর এতদিন যে লেখা থাকত 'দুনিয়ার সর্বহারা এক হও' এই কথাটি তুলে দিয়েছে! অথচ পত্রিকাটি যে সোশিয়ালিস্ট পার্টির এ কথা কিন্তু লেখা আছে!

স্মৃতি চারণ

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায় : বাঙালিমানসের এক অবিস্মরণীয় সেতুবন্ধ

পার্থ বসু

পুরনো আর নতুন অনেক শিল্প, অনেক সৃষ্টিকে আমরা সকলেই পছন্দ করি। ভালোবাসি। সেরকম একটি শিল্প গড়ে তুলতে চাই। সৃষ্টি করতে চাই। কিন্তু হয় না। সেই না-হতে পারা বা না-করতে পারাটাই তো চরম কথা নয়। আমার একটি ভালোবাসা আমি রূপ দিতে চেয়েছিলাম, এটাই তো সবচেয়ে বড় কথা। একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এরকম কথাই বলেছিলেন, মনে পড়ছে। 'সংসারে যাকে আমরা চেয়ে পাইনে সে-ও আমাদের ব্যর্থ করে না। না-চাইতে পারাটা হচ্ছে মরুভূমির ধর্ম। ···চাওয়ার মধ্যে প্রাণ আপনাকে সপ্রমাণ করে।' মনে হচ্ছে এমনতর কথাই সেই কবি বলতে চেয়েছিলেন।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আমাদের সময়ের লোক-প্রিয়তম শিল্পী। আমাদের আগের কালে ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক, কুন্দনলাল সায়গল, কখনো কাননদেবী, কৃষ্ণচন্দ্র দে। আমাদের সময়ও তো আপাতত অস্তাচলগামী। কিন্তু, আমাদের পরের প্রজন্মে সেরকম কারোও নাম এখন শুনিনি। যেমনটি শোনা আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা। এখনও পর্যন্ত দুই যুগের সেতুবন্ধী সওদাগর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ঐ এক শিল্পী। এই তথ্যটি জানবার জন্য তাঁর অনুরাগী হবারও দরকার নেই।

আমাদের মধ্যে অনেকেই হেমন্তর অনুরাগী। কিয়দংশ হেমন্তর অনুকারী। ঠিক তাঁর মত করেই তাঁর গানগুলি আবৃত্তি করে যেতে পারেন এমন দক্ষ গায়কের সংখ্যাও আজকম নয়। বাংলা সাহিত্যে যেমন বলা হয়ে থাকে, বঙ্কিমকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথ হাত পাকিয়েছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের সবেগে পশ্চাদ্ধাবন করেছেন

শরৎচন্দ্র—না, বাংলা গানে এখনও পর্যন্ত সেই তিন পুরুষের পরম্পরা স্পষ্ট হয়নি। পঙ্কজ মল্লিকের অনুকারী ছিলেন অবশ্যই হেমন্ত। তিনি নিজেও সেকথা স্বীকার করেছেন। কিন্তু হেমন্তর অনুকারী এখনও কর্ণগোচর হয়নি। কণ্ঠটি পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র; সেটি সহজপ্রাপ্য নয় যে, হেমন্ত প্রমাণ করে রেখেছেন এখনও।

অথচ জানা আছে, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠটি 'ট্রেন্‌ড্‌' ছিল না। অর্থাৎ, ভারতীয় ধ্রুপদী গানের তালিম যথাসময়ে তিনি যথাবিহিতভাবে সাধন করেননি। এই দুর্বলতা হেমন্তর গানে অনেক জায়গায় শ্রোতৃকর্ণে ধরা পড়ে থাকে। অথচ সেই চারের দশকের শেষ থেকে আটের দশকের সমাপ্তি পর্যন্ত চার দশক প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করে গেলেন যিনি তাঁকে কোন্ বিচার স্বাদে অস্বীকার করি? অথচ হেমন্ত চেয়েছিলেন একজন সম্পূর্ণ সংগীতশিল্পী হতে; পেশাদারী শিক্ষা বর্জন করলেন মধ্যবিত্ত ঘরের এক বঙ্গীয় যুবা কিংবা ধ্রুপদী সংগীতের চর্চাও সময়াভাবে স্থগিত রেখেছিলেন। সেসব কী সাহসে, জানতে ইচ্ছে করে! যেকথাটি সঠিক মনে হয়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বাংলা গানের স্বভাবটি ধরতে পেরেছিলেন।

বাংলা গানের সেই স্বভাব সম্পূর্ণ উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী গানের ঝরনার জলে তৈরি নয়। নয় শুধু বাংলা লোকসংগীত বা কীর্তনের ছায়াবলম্বনে। আধুনিক কালে তার পথ কেটেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর এসেছিলেন সেই পথেই দ্বিজেন্দ্রলাল অতুলপ্রসাদ রজনীকান্ত নজরুল। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান যদিও উত্তর ভারতীয় রাগভিত্তিক কিন্তু যাকে আমরা রবীন্দ্রসংগীত বলি, জানি রবীন্দ্রনাথের গানের অন্ত্যপর্বের অতুলনীয় সৃষ্টি বলে—তার অধিকাংশই মিশ্র সুরে গ্রথিত। তাকেই আপাতত বলা যেতে পারে বাংলা গানের স্বভাব।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে প্রিয় গান ঐ রবীন্দ্রনাথের গান। একথাটি তিনি একাধিকবার বহুভাবে বলেছেন। স্ব-রচিত আত্মকথা 'আনন্দধারা' বই-এর প্রথম দিকেই জানাচ্ছেন, 'রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য শুনেছি বিভোর হয়ে। গেয়েছি প্রাণ ঢেলে।···আজও যখন রবীন্দ্রনাথের গান করি কোনো ফাংশানে তখন শ্রোতাদের কতটা আনন্দ দিতে পারি জানি না, তবে গেয়ে নিজে অসম্ভব তৃপ্তি পাই।'

অথচ রবীন্দ্রনাথের গানের প্রাচীন এবং পক্ক শ্রোতারা যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি প্রীত ছিলেন এমন কথা কম শুনেছি। এমনকি একদা যাঁরা পঙ্কজকুমার মল্লিকের কণ্ঠে প্রথমদিকের রবীন্দ্রসংগীতকে সাধুবাদ দিয়েছেন তাঁরাও হেমন্ত'র কণ্ঠে রবীন্দ্রসংগীতের প্রতি কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখিয়েছেন।

এই উন্নাসিকতা সবসময়ই অমূলক নয়। যেমন উত্তর-ভারতীয় বা দক্ষিণী ধ্রুপদী সংগীতে কীর্তিলাভের জন্য পূর্ণ তালিমের দরকার নয়, তেমনি রবীন্দ্রনাথের গানেও যাঁরা 'সর্বসময়ের' শিল্পী তাঁদেরও তো সেই গানের সাধনা থাকা দরকার। শৈলেশ দত্তগুপ্ত হেমন্তকে বলেছিলেন গলায় রবীন্দ্রসংগীত তুলে নিতে; সেইসঙ্গে এই কথাও জানিয়েছিলেন যে, স্বরলিপি দেখেও রবীন্দ্রসংগীত গাওয়া যায়। স্বরলিপি অনুসরণের পদ্ধতিটিও প্রয়াত দত্তগুপ্ত মশাই তরুণ হেমন্তকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

তথাচ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া প্রথম রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড যেটি, সেই দুখানি গান, 'কেন পান্থ এ চঞ্চলতা' এবং 'আমার আর হবে না দেরি' এই দুটি গানেরই ট্রেনিং নিয়েছিলেন অনাদিকুমার দস্তিদারের কাছে। ট্রেনিং নেওয়াটা সাময়িক। বোঝা যায়, রেকর্ড করার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে। এবং সেই রেকর্ড যখন কণ্ঠ-সুবাদে বাজার পেল তখন ব্যস্ত শিল্পীর গান শেখার সময় খুঁজে নেবার ইচ্ছেটুকুও সহজেই চলে যেতে পারে।

ভারতীয় নিবদ্ধ সংগীত মাত্রেই চর্চার বিষয়। এবং অবশ্যই গুরুমুখী বিদ্যা। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তার পরেও প্রবলবেগে রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড করেছেন। প্রবলতর বেগে সেসব রেকর্ড বিক্রিও হয়েছে।

হেমন্তর গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানের রেকর্ড তালিকায় শুধু একবার দৃষ্টি রেখেও ধরে ফেলা যায়, সেইসব গানের অনেকগুলিই আগেই পঙ্কজ মল্লিক মশাই রেকর্ড করে গেছেন; অথবা অন্য কারও রেকর্ড হয়ে গেছে, সুপ্রচারিত না হলেও; এবং সমস্ত গানেরই চলাচল একটি সপ্তকেই সীমায়িত। হেমন্তর গীত রবীন্দ্রসংগীত থেকে অনেক দূরে থেকে গেছে রবীন্দ্রনাথের হিন্দীভাঙা গান, ঠুংরি বা টপ্পা-অঙ্গের গান। ধামার বা চৌতালে ধ্রুপদাঙ্গ গানও। যাকে আমরা বলতে পারি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যসংগীত, বলে থাকি, মিশ্র সুরের গান; কবির সরল সৃষ্টি: সেইসব গানেই হেমন্তর দৃষ্টি এবং কণ্ঠ সতত রত ছিল।

কারণ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কারো কাছে নিয়মিত এবং প্রথাগতভাবে রবীন্দ্রনাথের গান শিক্ষা করেননি। চলচ্চিত্র বা রেকর্ড করার প্রয়োজনে অনেকরকম গানের মধ্যে রবীন্দ্রসংগীতটি তুলে নিয়েছেন, তারপর তিনি অতীব কুশলতার সঙ্গে স্বরলিপি অনুসরণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের বিচিত্রসন্ধানী শ্রোতা সে-কারণে অনেকসময় তৃপ্ত হতে পারেননি। যথার্থ ট্রেনিং ছিল না বলেই যদি সুকণ্ঠ শ্রোতা হেমন্তর কণ্ঠে 'শুধু

তোমার বাণী নয় গো হে' বা 'শ্যামা' নাটকে বজ্রসেনের গীতাভিনয়ে 'হায় রে নূপুর' এমত কিছু গানে নীড়-হারানো সরল চেহারা দেখেন, সে-কারণে তাঁদের কোনো গোষ্ঠীভুক্ত করাও অসমীচিন।

রবীন্দ্রনাথের গানে এই তো ছিল হেমন্তর দুর্বলতা। আবার এইখানেই তাঁর শক্তি। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জানতেন তাঁর নিজের সীমাবদ্ধতা। একথাও জানতেন, মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চম পর্যন্ত যেমন তাঁর কণ্ঠ নামতে চায় না—স্থায়ী অংশে যার উদাহরণ, 'তুমি রবে নীরবে' গানের 'নিবিড় নিভৃত পূর্ণিমা' কিংবা 'আমি উন্মনা হে' পংক্তির স্বরসঞ্চার দেবব্রত বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনায় বড় মন খারাপ করে দেয়। আবার অন্যদিকে তারসপ্তকেও অধিক দূর যেতে চাইত না ঐ কণ্ঠ। অতএব, এইসব ধরনের গানগুলি হেমন্ত সন্তর্পণেই, মনে হয়, এড়িয়ে যেতেন। এ-স্বভাব অবশ্যই অতীব শ্রদ্ধেয়। হেমন্তর শেষ বয়সেও গাওয়া একটি গান, 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'—এ নিয়ে এক সংগীতবিদ অন্ধ হেমন্ত-ভক্ত বারেবারেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। কিন্তু যে-হেমন্ত স্বরলিপির সুদক্ষ অনুকারী তিনিও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত ঐ গানের স্বরলিপিতে বদ্ধ 'তা সে যতই কালো হোক' অংশে 'হোক' শব্দের উচ্চারণ সরগম বাদ দিয়ে এত ফ্ল্যাট করে দিলেন কেন? মানতে হয় আমাদেরই দুর্ভাগ্য।

আসলে গানশিক্ষার পরম্পরা এবং যথাবিহিত শিক্ষার সুযোগের অভাবেই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সব গান সাময়িক তৃপ্তিকর হয়ও, কিন্তু বেদনাজাত বা সান্ত্বনাসম্ভব হয়ে ওঠেনি। শব্দ বুঝতেন, অর্থও ধরতেন কিন্তু যথেষ্ট আস্থা ছিল না বলেই রবীন্দ্রসংগীতকে স্বকীয় প্রতিভায় আবিষ্কার করতে পারেননি, কখনো-বা আলোকিতও করেননি। স্বরলিপির সীমানার বাইরে গানের চিরকালের মুক্তি: সেই যাদুটি জানতেন দেবব্রত বিশ্বাস, জানেন শান্তিদেব ঘোষ, সুচিত্রা মিত্র এঁরা। রবীন্দ্রসঙ্গীতে হেমন্তর সেই আত্মবিশ্বাসটি ছিল না, বা একথা না-বলে বরং বলা যায়, হেমন্ত নিজের ক্ষমতা, সেই সামর্থ্যের সীমানা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন; অথচ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় নিজেই তো জানতেন 'আমি যে-কোনো নামে যা-কিছু দেব বাংলাদেশের গরিষ্ঠ শ্রোতা তাকেই অপ্রশ্ন অন্তরে স্বীকার করে নেবে'। কিন্তু নিজের সীমায়িত শক্তিকে নিরর্থক গরীয়ান করার মত চরিত্র এই সুভদ্র বঙ্গসন্তানের ছিল না। রবীন্দ্রনাথের গান তিনি গেয়েছেন কোনো রবীন্দ্র-দীক্ষিতের কথা ভেবে নয়। রবীন্দ্র-অজ্ঞজনের কথাটিও ভাবেননি। গেয়েছেন

নিজের ভালোবাসায়, অপরিমেয় শ্রদ্ধায়, 'আমার কাছে সব থেকে প্রিয় গান রবীন্দ্রসংগীত। এটা আমার প্রাণের জিনিস।···আমি তো জানি, সব চলে যাবে, একে একে বিদায় নেবে আমার গলা থেকে, কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না।'

এমন গভীর, গভীরতর কথা বলার মত শিল্পী এখনও কম একথা নিশ্চিত জানি।

আপাতত এই লেখার প্রথমে কবির যে-কথাটি উদ্ধার করেছি তার প্রসঙ্গটি আবার আনতে চাই। রবীন্দ্রনাথের গানের সমস্ত দিক ধরার মত কণ্ঠ বা প্রস্তুতি হেমন্তর ছিল না কিন্তু চেয়েছিলেন বারবার 'রবীন্দ্রসংগীত' যাকে বলে তাকেই নিজের জীবনের একতম এবং সর্বোত্তম সম্বল করে নিতে। তার ফল অন্যত্র দেখা গেল।

দেখা গেল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরযোজনায়। প্রথমদিকে এর-ওর-তার সুরে গান গেয়েছেন। সারাটা জীবন প্রবীণ এবং নবীন দুই বয়সের সুরকারের রচনায় গলা দিতে কোনোদিন আপত্তি ছিল না হেমন্তর। কিন্তু খুব স্থূলভাবে শুনলেও বলা যায়, সলিল চৌধুরী বা রবীন চট্টোপাধ্যায়, অনুপম ঘটক এরকম কয়েকজনের কমপোজিশন ছাড়াও তাঁর কণ্ঠে হালকাধরনের বাংলা আধুনিক গানও উত্‌রে গেছে তাঁর সুপরিচিত কণ্ঠ-সৌজন্যে।

কিন্তু হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্বয়ং যেসব কথায় সুর দিয়েছেন, বাংলা গানে তাঁর জায়গা কোথায় তা নিয়ে এখনও আলোচনা হয়নি। অবশ্যই তার জন্য সময়ের অনেকখানি অবকাশ দরকার পড়ে।

বাংলা আধুনিক গানে, মনে হয়, সুর দেবার সুযোগ হেমন্ত খুব বেশি পাননি। তাঁর সুরযোজনার সিংহভাগ দেখা যায় চলচ্চিত্রের গানে। এখানে হিন্দি গানের সুর উহ্য থাকুক। কিন্তু, 'শাপমোচন' থেকে শুরু করে আজীবন যেসব বাংলা চিত্রে তিনি সুরসংযোগ করেছেন সেগুলি আরও বহুকাল নিশ্চয় স্মরণীয় হয়ে থাকবে। হয়ত তার পেছনে আছে চলচ্চিত্রের প্রাসঙ্গিক দৃশ্য। আছে উত্তমকুমারের অভিনয়। কিন্তু, এমত কথা মান্য যে, বেশকিছু বাংলা চলচ্চিত্রে তার সমস্ত কিছু ভুলে গেলেও হেমন্তর সুরযোজনার জন্যই সেগুলি অনেককাল পেরিয়েও উজ্জ্বলন্ত থাকবে।

আমাদের মধ্যে অনেকে এখনও হয়ত নাম শোনেননি 'স্বর্গ হতে বিদায়' বা 'ত্রিধারা' কিংবা 'সূর্যমুখী' নামে বাংলা ছবি ছিল। কিংবা 'সপ্তপদী' বা 'ফুলেশ্বরী'

দেখেননি এমন দর্শকও এখন নিশ্চয় বিরল নয়। তথাচ ঐ ছবি-দুটির খ্যাতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর, তার সঙ্গে কখনো তাঁর কণ্ঠও। এবং যে-কথাটি বঙ্গীয় চলচ্চিত্রসমাজে প্রবচনপ্রতিম হয়ে উঠেছে যে, উত্তম-হেমন্ত জুটি একদা বাংলা রোমান্টিক বিশ্বে সুস্থায়ী হয়ে গিয়েছিল, সেখানেও হেমন্তর-ভূমিকা সম্ভবত অধিকতর। কারণ, আজ যখন উত্তমের মুখে হেমন্তর কণ্ঠ শুনি, শুনে যদি তারিফ করতেই হয় তবে সে সাধুবাদটি কার প্রাপ্য! কারণ, আমি তো ক্যাসেটে বা রেকর্ডে উত্তমকে দেখছি না। শুনছি হেমন্তকে।

এই বিষয়টিকে আর-একটু বিশদ করা যেতে পারে। কোনো ছবিতে বিশ্বজিতের মুখে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় গান করেছেন 'এই মেঘলাদিনে একলা ঘরে'; ছবিটা আমি দেখিনি, কিন্তু দ্রুত লয়ের গান হঠাৎ ঠিক পরিবেশে এখনও মনের মধ্যে ঢেউ তোলে। সেইরকমই তো সৌমিত্রর মুখে হেমন্তর গান, 'মানে না নয়ন কেন'—রাগের মৃদু স্পর্শেই মদির কণ্ঠে গানটি জীবিত হয়ে রয়েছে; ভূমিকাভিনেতা পিছনে পড়ে গেছেন। অথবা, ধরা যাক্, 'পথের ক্লান্তি ভুলে' কিংবা 'তোমার ভুবনে মাগো এত পাপ'—এসব গান ছবির নায়কের জন্যই যদি একটি-দুটি দশক পেরিয়ে যায় তাহলে সেইসব ছবির না-দেখা দর্শকের ভূমিকা কোথায় থাকে! মনে হয়, সেলুলয়েডের ছবি নিরুদ্দেশ হয়, গানই বুঝি থেকে যায়।

আসলে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জানতেন বাংলা গানের স্বভাবটি। ১৯৬৯ সালে একটি পুজোর গানের উল্লেখ করেছেন হেমন্তর ঘনিষ্ঠ এবং সংগীতজ্ঞ বান্ধব, 'আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুবতারা': তৎকালে চটুল বিদেশী সুরের জোয়ারে এক স্নিগ্ধ গানের আবেশ হেমন্তই আনতে পেরেছিলেন, এই দৃষ্টিটি রবি বসুর যথার্থ। আমরা উৎসুক হইনি, বা বিস্মিতও নই। কারণ, একমাত্র হেমন্তর কাছেই যেন, এমন প্রত্যাশিত। সমস্ত সাময়িক চাপল্যের উর্ধ্বে একটি চিরন্তনী ধ্রুবতারার নিশানাটি মনে হয় তাঁর জানা ছিল।

হেমন্তর যেসব গান এখনও সুশ্রাব্য বা স্মরণীয় কিংবা বলতে লোভ হয়, কাল-জয়ী—সেইসব গানের বাণী কিন্তু বড়ই দুর্বল। 'বসে আছি পথ চেয়ে ফাগুনের গান গেয়ে' বা 'লিখিনু যে লিপিখানি প্রিয়তমারে' কিংবা ধরা যাক্, 'স্মরণের এ বালুকাবেলায় চরণচিহ্ন আঁকি, 'বন্ধু তোমার পথের সাথীকে চিনে নিও', 'ও বন্ধু এই বকুল-ঝরা শ্রাবণরাতে' 'আমিও পথের মত হারিয়ে যাব' ইত্যাদি গানগুলির কথা কাব্য হিসেবে যদি পড়ি তাহলে তাদের 'পদ্য' বললেও কৃপা করা হবে। কিন্তু

এদেরই সুরসহযোগে আলো জ্বলে ওঠে। 'অলির কথা শুনে বকুল হাসে' বা 'তারপর ? তার আর পর নেই' এইধরনের গানগুলি গ্রামোফোন কোম্পানি বছরের পর বছর ধরে পুনর্মুদ্রণ করে চলেছেন নিত্যনতুন ক্যাসেটে তার কারণ, কিছুটা সুর এবং অনেকটাই কণ্ঠ : এর আর মৃত্যু নেই।

সেই অমৃত পেয়েছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর অদৃশ্য গুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। 'কোন্ বাণীর কী সুর হওয়া উচিত সেটা পেয়েছিলাম ওই রবীন্দ্রনাথের গান থেকে।' সেই যে তরুণবয়সের দীক্ষা তাতেই দীপ্তি পেয়ে গেল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সারাজীবনের সাধনা। যে-কোনো পঙ্গু বাণীও যে সুরের পাখায় ভর দিয়ে সময়ের দিগন্তপারে চলে যায়, বাংলা গানে রবীন্দ্রনাথের সর্বোজ্জ্বল দান তো এটিই। হেমন্তর সাফল্যের পিছনেও সেই স্বচ্ছ সতর্কতা। আবার বলছেন, 'এখনকার সুরকাররা আগে সুর করে তারপর গানের কথা লিখিয়ে নেন। এ কৌশল রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই করে দেখিয়ে দিয়েছেন।···সারা পৃথিবীর গানের সুরকে আয়ত্ত করে নতুন সুর সৃষ্টি করলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সুরের আলপনাকে বাংলা গানে ছিটিয়ে দিলেন। হয়ে গেল এক অপূর্ব সৃষ্টি। সর্বযুগের, সর্বকালের সৃষ্টি।' রবীন্দ্রনাথের সুররচনার কথাটি হয়ত সর্বাংশে সত্য নয়, কিন্তু মৌল বিষয়ের বিচারে ভুল নেই। অন্তত, হেমন্তর সুর রচনার প্রেরণায় এই আদর্শ অত্যন্ত সুফলপ্রসূ হতে পেরেছে। ভি. শান্তারামের মতো চলচ্চিত্রকারকে শুধু নিজের সুরযোজনার উৎসটি দেখাবার জন্য হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্বকণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ 'শ্যামা' শুনিয়েছিলেন। বলেওছিলেন তাঁকে, 'কিছু ভাববেন না শান্তারামজী। আমার গানের গুরু হলেন রবীন্দ্রনাথ। যে কোনো বিষয়েই ছবি করুন না, সব পাওয়া যাবে রবীন্দ্রকোষ থেকে। অফুরন্ত ভাণ্ডার ওঁর। সব আছে।'

এখানেই শেষ পর্যন্ত হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সার্থকতার জাদুদণ্ডটি যেন ঝলসে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের গানেই যাঁর পরম দীক্ষা, শুধু তাই নয়, তাঁর সুরালোকে যিনি স্নাত এবং তৃপ্ত হয়েছেন তাঁর তো সমস্ত সীমায়িত চাঞ্চল্যের ওপারে শান্তিসুন্দর সুরের তটরেখা দেখার কথা!

অতএব, 'যাকে আমরা চেয়ে পাইনে সে-ও আমাদের ব্যর্থ করে না।' রবীন্দ্রনাথের গায়ক হিসেবে হেমন্ত কতদূর সফল, এ-বিচার তো সময় করবে। কিংবা শুদ্ধ রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীর উচ্চাসনের সারিতে নাই-বা পেলেন আসন! হেমন্তর সুরে রবীন্দ্রনাথ স্পৃশ্য এবং উপলব্ধ হয়ে রইলেন।

রবীন্দ্রনাথের গান যে নির্বীজ নয়—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে তার সেই ধারাবাহিকতা চলমান হয়ে রইল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি, তাঁর গানের প্রতি এমনতর গুরুদক্ষিণা এখনও মনে হয় আর কেউ দিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের গান এবং বাংলা গানের আয়ু নিশ্চয় শত শরৎ পেরিয়ে যাবে এইভাবেই।

জহরলাল নেহেরু

পত্রগুচ্ছ

জওহরলাল নেহরুকে লিখিত এবং তাঁর নিজের লেখা মোট ৩৬৬ খানি চিঠির সংকলন। এইসব চিঠির অধিকাংশই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বে লিখিত এবং এইগুলি দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সেই সমস্যাসমূহ আমাদের কিভাবে প্রভাবিত করেছিল তারই মূল্যবান দলিল। এই বইয়ে যাঁদের চিঠি সংকলিত হয়েছে তাঁদের মধ্যে আছেন—মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, মতিলাল নেহরু, সুভাষচন্দ্র বসু, আবুল কালাম আজাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, মহম্মদ আলী জিন্না, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মাও-সে-তুং, মাদাম চিয়াং কাই শেক, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, জর্জ বার্নাড শ প্রভৃতি। দাম : ৭৫৲ টাকা

শম্ভু মিত্র

সন্মার্গ সপটা

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রযোজক এবং গণনাট্য সংঘের 'নবান্ন' নাটকের অন্যতম নির্দেশক। নাট্যকলা সম্বন্ধে তাঁর সৃজনশীল চিন্তা-ভাবনা এই বইয়ে গ্রথিত হয়েছে। দাম : ৪০৲ টাকা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গাথা সপ্তশতী

মহাপঞ্জী প্রাকৃতে লেখা এই সংকলনের নাম 'গাথা সওসঈ'। সংস্কৃতে 'গাথা সপ্তশতী'। এই কাব্যগ্রন্থ তারই অনুবাদ। দাম ৩০৲ টাকা

অমিতাকুমারী বসু

বিচিত্র বিবাহ

উত্তর পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে তাঞ্জোর, পশ্চিমে রাজপুতানা থেকে পূর্বে শ্রীহট্ট—এইসব দেশের বিচিত্র বিবাহ অনুষ্ঠানের চিত্র লেখিকা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে এঁকে তুলেছেন। দাম ২০৲ টাকা

এস. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলিকাতা ৭৩

নির্বাসন

আবদুল মান্নাফ

খবরটা ঝলসে উঠল। পাড়ায় পাড়ায়। ঘরে ঘরে। বৃদ্ধের মজলিশে। জলীল সাহেব এবার হজে যাচ্ছেন।

সম্ভাব্য হজযাত্রীর তালিকায় জলীল সাহেবের নাম ছিল না। আলোচনা প্রসঙ্গেও—এ নাম কারও মনে আসে নাই। শেখ সাহেব, আলি হোসেন, জাব্বার মল্লিক, হুমায়ুন সাহেব—তালিকার প্রথম শ্রেণীর নাম। গত দু'বছর ধরেই এরা হজ যাত্রার বাসনা ব্যক্ত করে আসছেন। সকলেই নিঃঝঞ্ঝাট ও পয়সা ওয়ালা মানুষ। আন্তরিক ব্যাকুলতাও আছে। কেন যে সুযোগ হয়ে উঠে না তা গ্রামবাসীর অজানা।

হঠাৎ জলীল সাহেব···অগ্রণী হবেন···গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করার সৌভাগ্যটুকু লুফে নেবেন—ভাবেনি কেউ। ধারণাও করেনি। এ গ্রামে হাজী নেই। আগে-পিছে কারও কোনো পিতৃপুরুষ মক্কার পবিত্র মাটি স্পর্শ করে আসেনি। দুঃখের কথা আজও এ গ্রামে হাজী বংশের জন্ম হয়নি। অথচ পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে প্রায় প্রতি বৎসর কেউ না কেউ হজে যাচ্ছেন। এ বেদনা সকলের।

জলীল সাহেবের হজ যাত্রার সংবাদে—গ্রাম আজ মাতোয়ারা। কিন্তু নায়ক জলীল সাহেবের মনে সুখ নেই। ঝিম ধরে বসে আছেন বৈঠকখানায়। এটাই তার সাধনার তীর্থ। পাকা দু'তলা বাড়ি। প্রথম থেকেই উপরে উঠেন নাই। বৈঠকখানাটিতে তাঁর সুসজ্জিত লাইব্রেরী, কোরাণ, হাদিস থেকে শুরু করে বেদ বেদান্ত গীতা এবং আধুনিক সাহিত্যের মোটামুটি সব বই স্তরে স্তরে সাজানো। চেয়ার-টেবিল-পালং-খাটে সুসজ্জিত বিছানা, পাশেই সোফার সেট। অভাব নেই কিছু। হরদম বাইরের মানুষের আনাগোনা, দেখা সাক্ষাৎ,—কাঁহাতক অহেতুক

উপরে উঠা নামা যায়। তাই বরাবর নীচেই থেকে গেছেন। লক্ষ্য কিছু মানুষকে জ্ঞান দান করে উপরে তোলা।

অথচ আর পাঁচজন মানুষের মতো তিনি হজখানার সংবাদে আনন্দিত নন। তাকে হজে পাঠানোর গভীর ষড়যন্ত্রটি আগেই ধরে ফেলেছেন। কিন্তু নিরুপায়।

এমনটি হওয়া উচিত নয়। জলীল সাহেব ইংরাজি ভাষায় এম. এ, বি. টি.। ভাষাটায় রীতিমত দখল রাখেন। মামলা-মোকদ্দমা থেকে শুরু করে—সর্বোপরি উপরতলার সব-রকম কাগজপত্র নিয়ে পার্শ্ববর্তী সকলেই ছুটে আসে। তর্জমা-সৎ-পরামর্শ, প্রতি-উত্তর সব-মেলে তার কাছে। তার অবস্থা এমন হবে ভাবতেই পারেন নাই জলীল সাহেব।

একহারা স্বাস্থ্যের ধপধপে সাদা মানুষ জলীল সাহেব। গোঁফ দাঁড়ি শূন্য মুখ। খুব মসৃণ। মাথার চুলে পাক ধরেনি। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। নিয়ম মাফিক নামাজ রোজাও করেন। ভক্তিতে বাড়াবাড়ি নেই। ধর্মই তার কাছে কর্ম। কথায় কথায় বলেন—সৎ কর্ম করার আর এক নাম ধর্ম।

পুণ্য অর্জনের জন্য মক্কা যাবার কথা তিনি জীবনেও ভাবেন নি। দেশ দেখার ইচ্ছা মনের কোণে কখনো কখনো উঁকি দিয়েছে বৈ-কি! তবে—এই ভাবে মক্কা যাবার কথা···না ভাবতেও পারছেন না জলীল সাহেব।

বিছানার উপর ঝিম ধরে বসে আছেন জলীল সাহেব। আহারে রুচি নেই। শরীর খারাপের অজুহাতে বৈকালিক আড্ডা বাতিল করে দিয়েছেন। দিনের আলো ধীরে ধীরে নিভে আসছে ঠিক আয়ুর মতই। এমন এক গুচ্ছ বিতৃষ্ণা মনের আঙিনায় আছড়ে পড়ছে। ছি, ছি, এ কি হলো? এতো সংসার নয়, দীর্ঘ-দিনের পরিশ্রমে তার সাজানো বাগান। সারা জীবনের সৎ পরিশ্রমের ফসল। এখানে মারাত্মক বিষ গজিয়ে উঠল কি করে?

এই মুহূর্তে তিনি এখন দস্যুর কবলে। তাঁর একমাত্র পুত্র কিবরিয়াকে দস্যু বলে মনে হলো। ষড়যন্ত্রের নায়ক। একান্ত বিশ্বাসী ঘুমন্ত মানুষকে পাঁকে পাঁকে বেঁধে ফেলার মতই—তাঁর একমাত্র পুত্র কিবরিয়া, যাকে তিনি তাঁর দেহের সমস্ত-টুকু রক্ত দিয়ে মানুষ করেছেন, কবে কখন যে তাঁকে কাঁটা তারে বেঁধে ফেলেছে বুঝতেও পারেন নাই।

কিবরিয়া সুশ্রী স্বাস্থ্যবান যুবক। বয়স ৪০। দুই সন্তানের পিতা। বড়ো ফিরোজ

—মেডিকেল কলেজের ছাত্র। ছোটটি নিতান্ত ছোট—সাত বৎসরের কন্যা। কিবরিয়া মার্চেণ্ট অফিসের চাকুরে।

আকাশে মেঘ ভর্তি। দিনের আলো নিভে গেছে। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সন্ধ্যার আগেই আঁধার ঘন হয়ে এল। মগরীবের আজান শুরু হলো। ধীরে ধীরে শেষও হলো। তবু জলীল সাহেব অজুর জন্যে উঠলেন না বা নামাজে দাঁড়ালেন না। দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে ঝিম মেরে বসেই রইলেন। কখন যে চাকরানিটা ল্যাম্পটা জালিয়ে দিয়ে গেছে, নজরে আসেনি। ছোট নাতনিটা কখন যে চুপি চুপি ঘরে ঢুকেছে বুঝতে পারেননি। সে দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে নাড়া দিল যখন তখন বুঝতে পারলেন দিনের আয়ু শেষ হয়ে গেছে।

নাতনিটা বার বার বলতে লাগল—ও দাদু, তুমি নাকি আমাদের ফেলে পালাবে?

ভীষণ ভাবে নাড়া দিল মনটা। ভিতরে তোলপাড় শুরু হলো। পালিয়ে আত্মরক্ষার নীতি তার নয়।

নাতনী দাদুর পিঠের উপর ঝুলতে লাগল। বার বার বলতে লাগল—ও দাদু, তুমি যেও না···জলীল সাহেব নীরব।

উত্তর দেবার ভাষা নেই। যাবার সময় হলে কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে না। ধরে রাখা যায় না। কি করে বুঝাবেন এই ছোট বালিকাটিকে! নিষ্পাপ শিশু। এখনও স্বার্থের সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি। তাই সে তাকে ধরে রাখতে চাইছে। কিন্তু শিশুর মা-বাপের কাছে তার যাওয়াটাই যে কাম্য। এই জন্যেই তো হজে পাঠানোর ষড়যন্ত্র।

ভিতরে ভিতরে এত লেখালেখি, নিজহাতে পিতার সই করা পাশপোর্ট, পারমিশান, টাকা পাঠানো—সবকিছু সাঙ্গ হলো অথচ ঘুণাক্ষরেও তাকে জানানো হলো না। বাপের সঙ্গে ছেলে আলোচনায় বসল না। তাঁকে হজে পাঠাবার মতো ঘরে যথেষ্ট টাকাও ছিল না। ঋণ-দেনা করতে হয়েছে, সেটাও বুঝতে দিল না। সব আয়োজন যখন সারা, তখনি ঘোষণা করা হলো—আব্বা হজে যাচ্ছেন। পাশের গ্রামের আল্লারাখা সাহেবকে সঙ্গী পাওয়া যাচ্ছে যখন, তখন আর কাঁহাতক এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া তাই হঠাৎ জলীল সাহেবের একমাত্র পুত্র কিবরিয়া তার পিতার যাত্রার ব্যবস্থা করে ফেলেছে।

কিবরিয়ার সুখ্যাতির বোমা ফেটে উঠল। গ্রামে এমন ছেলের বাপ হতে পারে কজন?

জলীল সাহেব কিন্তু কিবরিয়ার জন্য মোটেই গর্বিত নন। কিবরিয়ার চরিত্র এখন তাঁর কাছে সুস্পষ্ট।

যার অপরাধ বোধই নেই, তাকে কি মানুষ ভাবা যায়? স্বার্থান্ধ মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য কি? জলীল সাহেব ধরেই ফেলেছেন একটা পাপবোধ ঢাকা দেবার জন্যেই তাকে হজে পাঠানো হচ্ছে। জলীল সাহেব এখন কিবরিয়ার স্বার্থের প্রতিবন্ধক। তাই তাকে তাড়ানো হচ্ছে। হজে পাঠানো একটা নিছক ধর্মের আবরণ। গ্রামবাসীর চোখে ধুলো দেওয়া ছাড়া আর কি? পিতাকে ঘর থেকে বিতাড়ন বা পিতার কাছ থেকে সরে আসা—কোনোটাই যখন সম্ভব নয়—চতুর কিবরিয়া খুব সুকৌশলে এ পন্থা বেছে নিয়েছে।

পিতার চরিত্র কিবরিয়ার অজানা নয়। ধর্মের সূক্ষ্ম নিয়ম নীতির প্রতি তিনি কোনোদিন আস্থাশীল নন। দেশের মাটিতেই নজীরবিহীন ভালো কাজের দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়াই তার মূল লক্ষ্য।

যে শিক্ষায় মানবিক চেতনার বিকাশ নেই, মানুষের প্রতি মমত্ব বোধের জাগরণ নেই, সৎ কর্ম্মের প্রেরণা নেই, সেই সব শিক্ষার তিনি চিরদিন তীব্র বিরোধী।

জলীল সাহেবের হজে যাওয়ার সংবাদের সঙ্গে সঙ্গে—পিতৃভক্ত কিবরিয়ার প্রতি গ্রামের মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা বেড়ে গেল দ্বিগুণ।

জলীল সাহেব কিন্তু ঘৃণা বিদ্বেষে নির্বাক।

ছোট নাতনিটা—যেমন চুপি চুপি এসেছিল, তেমনি চুপি চুপি চলে গেল। একটা নির্বাক স্ট্যাচুর কাছে কাছে কতক্ষণ মুখর থাকা যায়?

নিঝুম বৈঠকখানা পড়ে রইল শবের মতো। টিমটিম করে আলো জলছে ঘরে। বাহিরে বিশ্রী আবহাওয়া। ঠিক তার মনের ভিতরের অবস্থার মতই। টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে বাহিরে। চারদিকে গাঢ় অন্ধকার। দূরে কুকুরের চীৎকার।

ছাতা মাথায় হঠাৎ দুটি বৃদ্ধ মানুষ লণ্ঠন হাতে ঘরে ঢুকেই বলল—আস-সালামো, আলাইকুম। জলীল ভাই। চমক খেলেন জলীল সাহেব। নজর তুলে মুখ খুললেন। প্রতি উত্তরটা ঠিক সুস্পষ্ট নয়। জড়ানো বক্রেশ্বার মতো ছড়িয়ে পড়ল। জলীল সাহেবের হাতদুটি ধরে খুব গদগদ কণ্ঠে বললেন—খুব সুসংবাদ।

আল্লা তোমার ইচ্ছা পূরণ করুন। একেই বলে ছেলে, যোগ্য কাজই করেছে। দশ পাঁচ করে কি হবে—যাকে বলে এক চন্দ্র আলো করে জগৎ সংসার।

ইতিমধ্যে আরও কিছু মানুষ এসে বসেছে। জলীল সাহেবের আশে-পাশে। বিভিন্ন বয়সের মানুষ। তাদের চোখে মুখে উপচে পড়া শ্রদ্ধা। এই ভাগ্যবান মানুষটিকে দেখতে এসেছে তারা। সবশেষে এলেন—শেখ সাহেব। পাতলা দেহ। গালে ছড়ানো ছিটানো অযত্নের দাড়ি। পরনে মারকিনের লুঙ্গি, গায়ে মারকিনের পাঞ্জাবি। মাথায় টুপি। চলনে বলনে বৈরাগ্যের ছাপ। পাঁচ ছেলের বাপ। স্ত্রী বিয়োগ হয়েছে এক যুগ আগে, পাঁচ ছেলেই চাকুরে, প্রতিষ্ঠিত। নিঃঝঞ্ঝাট মানুষ। বারবার অনুরোধ করেছেন—ওরে তোরা আমাকে এবার, হজে পাঠিয়ে দে। দুঃখের কথা। এ আবেদনে সাড়া মেলে নাই। ছেলেরা জানে—আব্বা আছেন, তাই দেশের ঘরবাড়ি পুকুর আছে, জমি জায়গার ভাবনা মুক্ত তারা। গায়ে হাওয়া লাগিয়ে চাকরি করে ছেলে মেয়ে নিয়ে স্ফূর্তি করে বেড়াতে পারছে। পূজার ছুটিতে সামসুল এসেছিল। কনিষ্ঠ সন্তান। মা হারা ছেলেটাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন। কণ্ঠে করুণা ঢেলে আবেদন করলেন—ওরে ও সামসুল! আলি নগরের আন্নারাখা এবার হজে যাচ্ছেন, তোরা আমাকেও পাঠিয়ে দে। সামসুল তখন বালিশে ঠেস দিয়ে, বিছানায় বসে চটকদারী উপন্যাস পড়ছিল। আব্বার আবেদন শুনে হো হো করে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে বলল—আব্বা, মক্কার মাটিতে পা দিলেই বুঝি সব গুণা মাফ হয়ে যায়? এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন? মক্কা গিয়ে যে টাকাটা নষ্ট করবেন, ঐ টাকাতে এই গাঁয়ের মানুষের জন্যে কিছু করুন না? আপনার কোনো কাজে তো আমরা বাধা দিচ্ছি না।

জলীল সাহেবও তার ছেলের কাছে—ঠিক এমনি কথাই আশা করেছিলেন। মা-মরা ছেলেকে তিনি নিজের রক্ত ঢেলে মানুষ করেছেন। ভাবতে অবাক লাগে—সেই ছেলে আজ এত অমানুষ হতে পারল? এই ছেলের জন্যে তিনি দ্বিতীয় বিয়েকে মনে স্থানও দেননি। জলীল সাহেব নির্বিরোধী মানুষ। রিটায়ারড হেড মাস্টার। সকলের শ্রদ্ধেয় মানুষ। যতদিন স্কুলে ছিলেন—ঝঞ্ঝাট হয়নি ততদিন। প্রথম পর্যায়ে ছেলেও ভালো ব্যবহার করত, বৌমাও ভালো ছিল। শাশুড়ীর মৃত্যুর পর, শ্বশুরের সেবা যত্নের ত্রুটি রাখেনি। কোনো অশান্তি ছিল না ঘরে। অবসর গ্রহণের পরই সমস্যার উদয়। সবটুকু সময় ঘরেই থাকেন। বাড়ির

সালমার প্রতি নজর গেল। তেরো চোদ্দ বৎসর বয়স। মা-বাপ মরা মেয়েটি বুড়ি ফুফুর কাছে মানুষ। সেও গত হয়েছে। সালমা স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী। হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলেন—তাঁর অবর্তমানে, তাঁর ঘরে একটা বই খুলে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়ছে।

পিছন থেকে লক্ষ্য করলেন জলীল সাহেব। তিনি জহুরী। সালমার স্পষ্ট উচ্চারণ এবং রিডিং পড়া শুনেই বুঝলেন এ মেয়ে নিঃসন্দেহে মেধাবী।

সালমাকে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। ইংরাজি পড়া, লেখা দু চারটে অঙ্ক করিয়েই বুঝলেন—সালমা বিস্ময়কর বুদ্ধিমতী। এ জিনিস হেলায় নষ্ট করা নিঃসন্দেহে পাপ।

অবসর সময় দুপুর বেলায় মেয়েটাকে নিয়ে নতুন খেলায় মেতে উঠলেন। স্কুল ফাইনাল বিষয়গুলি পড়িয়ে অভাবনীয় রেজাল্ট পেলেন।

এর ফলে ডাক দিয়েও সালমাকে আর পাওয়া যায় না। গৃহকর্মে টান পড়তে লাগল। অফিস ফেরতা স্বামীকে চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিয়ে কণ্ঠে রসিকতা ঝরালো—আব্বাকে কয়েকটি টিউশনির ছাত্র-ছাত্রী জোগাড় করে দাও?

ঠোঁট থেকে চায়ের কাপ বিচ্ছিন্ন করে জানতে চাইল—কেন? আব্বা তো চিরদিন টিউশনি-বিরোধী।

—দুপুর বেলায়, আব্বা এখন, সালমাকে পড়াতে শুরু করেছেন।

—তাই নাকি? হাসতে হাসতে বলল, সারা জীবন তো ছাত্র পড়িয়ে কাটিয়েছেন। সেই অভ্যাসটা নিশ্চয়ই ছাড়তে পারছেন না। সালমাকে পড়িয়ে—ওনার যদি সময় কাটে তো কাটুক।

এই হালকা বিষয়টা একদিন জটিল হয়ে উঠবে—ওরা কেউ ভাবতে পারেনি।

ধীরে ধীরে সালমার পড়ার সময় বাড়তে লাগল। কাজের সময় কমতে লাগল। কাজের সময় ডাক দিয়েও সালমাকে মেলে না।

একদিন বেশি ডাকাডাকি করতেই জলীল সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন বৌমা, এত ডাকাডাকি করছ কেন? সালমা এখন অঙ্ক করছে।

এধারে এক গাদা কাজ পড়ে রয়েছে যে আব্বা?

নাজমাকে বুঝাবার চেষ্টা করলেন জলীল সাহেব; জানো বৌমা, মেয়েটা ভীষণ বুদ্ধিমতী। প্রখর স্মৃতি শক্তি। কয়েক বৎসরের পড়া কয়েক মাসে শেষ করে দিল! আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে এমন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী একটাও

পাইনি। এবার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় বসাব। দেখবে, সালমা প্রথম বিভাগে পাশ করবে।

কথাগুলো থমকে দিল নাজমাকে। সে আজ একটা যুদ্ধং দেহি মনোভাব নিয়েই এগিয়ে এসেছিল। তাই সে ফিরে গেল না। গৃহিণীসুলভ মুখটা থমথম করে উঠল। পানের রসে সিক্ত আদুরে ঠোঁট দুটো উল্টে দিয়ে বলে উঠল—বাড়ির ঝিকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় না বসিয়ে, একটু ধর্মকর্ম করুন না বাবা।

দপ্ করে জ্বলে উঠলেন আগুনের মতো। সঙ্গে সঙ্গে সংযত করলেন নিজেকে—যুক্তি দিয়ে বুঝাতে চাইলেন। একটা অসহায় বুদ্ধিমতী মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো কি ধর্মের কাজ নয় বৌমা?

যার যা কাজ তাকে তাই করতে দেওয়াই ভালো। সালমা যদি সবসময় পড়াতেই থাকবে, তাহলে এ সংসারের কাজকর্ম করবে কে?

আমাদের যখন সামর্থ্য আছে, তখন আর-একটা লোক রাখো।

সব শুনে কিবরিয়া গম্ভীর হয়ে গেল।

সামনে নাস্তা পড়েই রইল। নাজমা তাড়া দিল—নাস্তাটা খাও। ধীরে ধীরে হাত দিল রুটিতে। একটুকরা রুটি ছিঁড়ে মুখে পুরল। রুটি চিবুতে চিবুতে বলল কিবরিয়া—তাই তো ভীষণ ভাবনায় পড়লাম।

এত ভাবনার কি আছে? আব্বাকে সরাও এ সংসার থেকে।

রুটির থালা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চিৎকার করে উঠল কিবরিয়া।—কি বলতে চাও তুমি? আব্বাকে তাড়িয়ে দেওয়া, বা নিজেদের সরে যাওয়া দুটোর কোনটাই কি আমার পক্ষে সম্ভব? লোকে বলবে কি?

তাহলে আর একটা লোক রাখো।

কোনো আপত্তি নেই, স্বচ্ছন্দে রাখতে পারো।

তারও যদি বুদ্ধি ভালো হয়, উনি তাকেও তো পরীক্ষায় বসাতে চাইবেন। দুটো লোক রাখার খরচ কি কম? তাছাড়া ফিরোজকে মাসে মাসে পাঁচশো টাকা করে গুণতে হয়। বছর খানেক পরেই সে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে আসবে, এই সময় তার টাকায় তুমি টান দিতে পারো না? আব্বা শিক্ষিত মানুষ তবু অর্থ-নীতির উনি কি কিছুই বোঝেন না?

উনি যেটা বুঝেছেন, সেটা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই নাজমা।

কণ্ঠে কান্না ঝরালো নাজমা।—বেশ, কিছুই যখন করা সম্ভব নয়, তখন আমাকেই ঝি-গিরি করতে হবে।

নাজমা লোক রাখেনি। সকালে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঘর ঝাঁটা দিতে শুরু করল। সালমা ছুটে এসে ঝাঁটা কেড়ে নিত। এঁটোথালা-বাসন ধোয়া, ঝাঁটা দেওয়া, মোটামুটি সবই করছিল পড়ার ফাঁকে ফাঁকে।

জলীল সাহেব সালমাকে পরীক্ষায় বসালেন। জলীল সাহেবের ধারণা ঠিক। সালমা ফার্স্ট ডিভিশনে পাশও করল। কলেজে ভর্তি করে দিলেন। সালমার চেহারার খুলতাই হয়েছে। স্বাস্থ্য-শ্রী এমনিই সুন্দর। এখন আরও সুন্দর হয়েছে। এমন মেয়ে সচরাচর নজরে পড়ে না। ফিরোজ পর্যন্ত সালমাকে দেখে চোখ ফেলতে পারে না। প্রথমে তো চিনতেই ভুল করেছিল।

জলীল সাহেব বললেন—এ মেয়ে অসাধ্য সাধন করেছে! তোর চেয়েও বেশি নাম্বার পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে।

ফিরোজ ভীষণ খুশি। ঝলমল করে উঠেছে—দাদু সত্যিই তুমি অসাধ্য সাধন করেছ। ওকে তুমি পড়িয়ে চল। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।

এই পর্যন্ত সব কিছু সীমার মধ্যেই ছিল। একটু-আধটু উত্তপ্ত হলেও বা ঝড়ো হাওয়া উঠলেও সংসার তন্ন-ছন্ন হয়নি। সংযম শাসনে মনের ক্ষুব্ধতা চাপা ছিল।

কিন্তু ফিরোজের বিয়ের জন্য এক লাখ টাকা অফার এল যখন, ঝড় উঠল তখনি। মেয়ে সাধারণ, রং ময়লা, নাক চাপা। তবু টাকার লোভে জ্ঞানহারা হয়ে উঠল কিবরিয়া। নাজমাও লোভে পাগল।

জলীল সাহেব হুঙ্কার ছাড়লেন—এ বিয়ে বন্ধ করো।

রুখে দাঁড়ালো নাজমা। মাথার আঁচল খসে পড়ল। কেন?—বড় ঘর, বড় বংশ, তাছাড়া পাওনাটাও কম নয়।

—পণ নেওয়া হারাম।

তর্কে নামল নাজমা। তবু তো দুনিয়ার মানুষ নিচ্ছে। একটা ছেলেকে ডাক্তার বানানোর খরচ কি কিছু কম? কেউ স্ব-ইচ্ছায় যদি যৌতুক হিসাবে কিছু দেয়—তা গ্রহণ করা হারাম হবে কেন?

বোঝাতে চাইলেন জলীল সাহেব।—অনুভূতির ধার নষ্ট হয়ে গেলে, পাপ-পুণ্যের সীমারেখা সহজে চেনা যায় না, বৌমা। যাক সে কথা, ভেবে দেখো তো—এ বিয়েতে ফিরোজের লাভ হবে কি?

—সে নগদ এক লাখ টাকা পাচ্ছে।

—যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছ, সেই মেয়েটি কি ফিরোজের যোগ্য ?

ঘর সংসারের জন্যে এ মেয়েই যথেষ্ট।

—ফিরোজের ভবিষ্যতকে ছোট করে দেখো না বৌমা। ভবিষ্যতে সে বিদেশ যাত্রার সুযোগ পেতে পারে। ভবিষ্যতে মস্তবড় হাসপাতালের দায়-দায়িত্ব কাঁধে চাপতে পারে—তোমার এ মেয়ে কি তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে ?

এর চেয়ে ভালো মেয়ে কোথায় ?

আমাদের হাতের কাছেই তো ভাল মেয়ে রয়েছে, বৌমা।

কার মেয়ে ?

কেন, আমাদের সালমা ?

দপ করে আগুনের মতো জ্বলে উঠল নাজমা। কেঁপে উঠল শরীর—দরজাটা আঁকড়ে না ধরলে নিশ্চয়ই পড়ে যেত। চিৎকার করে উঠল—কি বললেন, আব্বা ? বাড়ির ঝিয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে ?

কাকে ঝি বলছ বৌমা ? শুধু আমাদের সমাজে কেন, এদেশে সালমার মতো মেয়ে কয়টা ? সুযোগ, পরিবেশ পেলে এ মেয়ে ডাক্তার হতে পারে, বৈজ্ঞানিক হতে পারে ! অধ্যাপিকা হওয়া তো কিছুই নয় ! এমন সুশ্রী-সুস্বাস্থ্য কয়টা মেয়ের থাকে ? ব্যবহারেরও তুলনা নেই।

ছেলের ডিস্‌পেনসারি খোলার টাকা দেবে কে ?

বৌমা, মেঘ গর্জন করে উঠল—তোমার নির্লজ্জ লোভ আমাকে স্তম্ভিত করছে। ভালো করে শুনে রাখো। সালমাকে বৌ না করলে, আমার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে ; পাচ্ছিলে এক লাখ, আমার সম্পত্তির মূল্য প্রায় এক কোটি···

নাজমা বোবা।

টলতে টলতে ফিরে এল। আব্বার শেষ সিদ্ধান্তে কিবরিয়াও হতবাক।

নিস্তব্ধতার বুকে ঘড়ির টিক টিক শব্দ পিন ফুটাচ্ছে। রাত বাড়ছে। মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে। ওরা বসে আছে পাশাপাশি। কথা নেই। জালনার পর্দা দুলছে। বাইরে কুকুরের চীৎকার। ঘরের ভেতরে স্তব্ধতা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল নাজমা। উদ্‌গত কান্না চেপে ধরে বলল—ওগো, একটা কিছু করো।

অনুরূপ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে জবাব দিল কিবরিয়া—কিছু একটা করতেই হবে।

—কি করবে ভাবছ ?

—যাতে সাপও না মরে, লাঠিও না ভাঙে !

—সেটা কি করে সম্ভব ?

—অসম্ভবকে সম্ভব করতেই হবে। তবে ভালো ব্যবহারের ফাঁক রেখো না।

তার পর থেকেই জলীল সাহেবকে হজে পাঠানোর ষড়যন্ত্র শুরু হলো।

শেখ সাহেব জলীল সাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন,—তুমি ভাগ্যবান। ধন্য তোমার পিতৃ জীবন। আমার ছেলেরা কেন এমন হলো না ? আমি এখন ওদের হাতে বন্দী। তাই নিজের ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না।

জলীল সাহেবের ঝিমুনি ভাবটা কেটে গেল। উজ্জ্বল হয়ে উঠল চোখের দৃষ্টি। চীৎকার করে বললেন—শেখ সাহেব, তোমার ছেলের চেয়েও কিবরিয়া বেশি স্বার্থবাজ। তোমার ছেলেরা সরল, আর আমার কিবরিয়া চতুর। কিবরিয়ার মুখোশটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছা করল। না—আর নয়, এ সংসারের শেষ ভালবাসাটুকু মুছে গেছে, মন এখন বেদনায় ভরপুর। বিদ্রোহী হবার বয়স নাই।

শেখ সাহেব একটা বাঁধানো খাতা জলীল সাহেবের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—এটাতে কোথায়, কি দোয়া দরুদ পড়তে হয়, লেখা আছে, বাসনা ছিল, তাই সংগ্রহ করে রেখেছিলাম। এখন তোমার কাজে লাগুক।

জাকার সাহেবও উপদেশ দিলেন—কাবার পথে এটি কাছে রাখবেন, এটা থাকলে কোথাও হোঁচট খেতে হবে না।

রাত্রি হলো। বৃষ্টি ধরেছে ! একে একে সকলে বিদায় নিল। দপ্ করে ঘরের আলো নিভে গেল। ঠিক মনের শেষ আশাটুকুর মতই।

চার দেওয়ালের ভিতর জলীল সাহেব এখন বন্দী। কানের ভিতর লক্ষ হাতের করতালি—তুমি ভাগ্যবান, ভাগ্যবান···এরা কেউ জানে না—কি জঘন্য চক্রান্তের সে শিকার হয়েছে। কিবরিয়ার উদ্দেশ্য অনেক আগেই বুঝে ফেলেছেন। তাই তার বাড়ানো কাগজপত্রে নির্বিবাদে সই করেছেন—শুধু দুঃখ কিবরিয়া তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার জন্য, এমন ফাঁদ পাততে পারল ? তার মায়া হলো না ? বুক কাঁপল না ?

চোখ ফেটে জল গড়িয়ে এল, বিছানায় পড়ে যন্ত্রণায় এপাশ ওপাশ করতে

লাগলেন। ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির এমন হাতিয়ার করে এমন ভাবে ব্যবহার করতে আগে কখনও কাউকে দেখেননি।

এ তো হজ যাত্রা নয়—নির্বাসন। কিবরিয়া এমনভাবে তাকে নির্বাসন পাঠাতে পারবে—ভাবতে পারেন নাই।

না তিনি আর মক্কা থেকে ফিরবেন না।

কেন ফিরবেন? কার জন্যে—কাদের টানে ফিরবেন? এই স্বার্থান্ধ সংসারের চেয়ে মক্কার মরুভূমি নিঃসন্দেহে অনেক ভালো।

সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ কতটা সমাজতান্ত্রিক

অনিমেষ দস্তিদার

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনে, তিয়ানানমেন স্কোয়ারে ৪ জুন ১৯৮৯-এর ঐতিহাসিক ক্র্যাক্‌ডাউন বিশ্বের সমস্ত দেশে আরেক ক্র্যাক্‌ডাউন অনিবার্য করে তুলেছে, এ ক্র্যাক্‌ডাউন শতবর্ষের মার্কসীয় ধ্যানধারণায় ব্যবহার্য জীর্ণ শব্দকোষে (ভোকাবুলারি) গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র প্রভৃতির প্রচলিত সংজ্ঞার্থে। আরও বেশি সম্ভবত সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের পদ্ধতিগত প্রশ্নে। মার্কিনী ছাপমারা উদারনৈতিক সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রবক্তারা চীনের স্বতঃস্ফূর্ত (?) ছাত্র আন্দোলনে সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণত 'ভোগে যাওয়া' সম্পর্কে স্থির নিশ্চয় হয়েছেন। তিয়ানানমেন স্কোয়ারে তাঁরা 'স্ট্যাচু অব লিবার্টির' মহান অধিষ্ঠান লক্ষ্য করেছেন। ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষিতে চীনের বৃহত্তর জনগণের এমনকি প্রাগ্রসর শ্রমিক শ্রেণীর কণ্ঠে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্রের জিন্দাবাদ ধ্বনিও তাঁরা শুনতে পেয়েছেন।

ছাত্র আন্দোলন যে নেহাৎ কাকতালীয় ভাবে এপ্রিল মাসে হুয়া গুও ফেং এর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে, মার্কিন যোগসাজসে গড়ে ওঠেনি, প্রমাণস্বরূপ তাঁরা তুলে ধরছেন চীনের গত এক দশকের অর্থনীতি, সংবিধান সংশোধনী, এককথায় সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের দেং নেতৃত্বপ্রদত্ত রূপরেখা। তাঁরা তথ্য দিয়ে দেখাচ্ছেন, আধুনিকীকরণের প্রশ্নে মাও-উত্তর চীনা অর্থনীতির মরিয়া উদ্যোগ। সেই উদ্যোগের হাত ধরেই চীনে কৃষি থেকে শিল্পে সর্বত্র ব্যক্তি মালিকানার পুঁজি বিকাশের দ্রুত অগ্রগতি। আর এই বিকাশের ধারা অনুসরণ সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের পথে চীনা নেতৃত্ব কিভাবে মার্কিন বহুজাতিক পুঁজি, জাপানী পুঁজি, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে অনিবার্য গাঁটছড়া বেঁধে মুক্ত দুনিয়ার অর্থনীতির ছাঁদনাতলা

এসে দাঁড়াচ্ছে, তার পরিসংখ্যানও নেহাৎ কম নয়। যদিও ভারতের তুলনায় কিছুই নয়, তবুও চীনের বৈদেশিক ঋণ গত তিন বছরে চারগুণ বেড়ে গিয়ে ৮০০০ কোটি ডলার। এ প্রেক্ষাপট থেকে ছাত্র আন্দোলন এবং ক্র্যাকডাউন্ দুয়ের তাৎপর্যই কমবেশি আমাদের বোধগম্য। হংকং, তাইওয়ান বা জাপান থেকে আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা প্রেরিত ক্র্যাক্‌ডাউনের প্রামাণ্য চিত্রমালাও আমাদের অদেখা নয়। অনস্বীকার্য, তবে প্রশ্ন ওঠেই, সমাজতান্ত্রিক কি আধুনিকীকরণে এ তাবৎ কালের ধারণা অনুযায়ী আর সমাজতান্ত্রিক থাকছে না? আধুনিকীকরণের চরিত্র কি সমাজতান্ত্রিক দেশেও হতে পারে সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক কিংবা সমাজ তান্ত্রিকতার সঙ্গে ওই দুই তন্ত্রের এক জটিল মিশ্রণ? এ প্রশ্ন, বিশ্বপরিস্থিতিতে গোলমাল ডেকে আনে। বিশ্বের তাবৎ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আধুনিকীকরণের গর্ভযন্ত্রণার সমস্ত প্রলক্ষণকে বিচার্য করে তোলে। মার্কসীয় দর্শনের আলোকে রাজনীতি, তার ধারক ও বাহক পার্টি একটা মীমাংসাসূত্রে পৌঁছলেও, অর্থ-নৈতিক অস্থিরতার অবকাশ থেকে যায়, থাকেই। মনে রাখা ভালো ইতিহাসের দ্বান্দিক অগ্রগতিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির যদি অগ্রগতি ঘটে থাকে, (যদি কেন, নিশ্চয়ই ঘটেছে, তাহলে চরম সংকট ঘনীভূত হতে হতেও গত পাঁচদশকে পুঁজি-বাদী ব্যবস্থারও অগ্রগতি ঘটেছে। যতক্ষণ পুঁজিবাদের অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব ওই ব্যবস্থার ধ্বংসের উপযোগী স্তরে না পৌঁছচ্ছে, ততক্ষণ অর্থনীতির হিসাব নিকাশে, বিশ্বপরিস্থিতিতে পুঁজিবাদের বিশ্বগতি তো অগ্রগতিই। এক অর্থে এ হলো সামাজিকীকরণের (সোসিয়ালাইজেশনের) ব্যাপকতর রূপ, অন্য অর্থে উৎপাদনের উপাদানের ব্যক্তিমালিকানার সঙ্গে ওই সামাজিক উপাদানগুলির দ্বন্দ্ব। বিকাশ দুটিই। এক্ষেত্রে চীনের গরিব চাষী মোটা ভাত কাপড় পায় কিনা, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরিদ্রতম চাষীর জীবনমান কেমন এ শুধু এক ভৌগোলিক সীমারেখায় এক রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বিকাশভাবনার পরিচিতি মাত্র। তার বেশি খুব একটা নয়। এমনকি, যে দেশ মোটা ভাত কাপড়ে নিশ্চিন্ত করে, সে দেশের ভাত কাপড়ের সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্ক সমাজতান্ত্রিক হবে—এমন কথা মার্কসীয় তত্ত্বেও বলে না।

ভাত কাপড়ের এই স্তরের সমাজতন্ত্রে যদি উৎপাদন সম্পর্ক একশোভাগ সমাজতান্ত্রিক হয়েও ওঠে, তবুও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা নেতৃত্ব সেখানেই ইতি টানতে পারে না। কারণ সমাজতন্ত্রের দুর্গম পথে পার্টি অধীত রাষ্ট্র অধীত মোটা ভাতকাপড়ের স্তর একান্ত প্রাথমিক স্তর। বিশ্ব অর্থনীতিতে আণবিক

বোমার স্থান আছে, সুপার কম্পিউটারের স্থান আছে। রঙিন টেলিভিশন কিংবা বীর্যবৃদ্ধিকারক অথবা জন্মনিরোধক পিলের মতো পণ্য অনিবার্য হয়ে পড়ছে। সুতরাং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও মুক্ত দুনিয়ার পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামোর সঙ্গে গা ঘষাঘষি করতে হচ্ছে। হয়ত ব্যক্তিমানুষ হিসাবে দুই শিবিরের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার ক্ষেত্রে মৌলিক তফাৎ সামান্যই। আর এই রূঢ় বাস্তবে বিমুখ হওয়ার অর্থ বিচ্ছিন্নতা—বিশ্ব উৎপাদন কাঠামোয় একঘরে হয়ে থাকা। এও কি অমার্কসীয় নয়? সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের কণ্টকাকীর্ণ পথের রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা চীনেই প্রথম ঘটল, এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। বিপ্লবোত্তর সোভিয়েত রাশিয়ায় লেনিন পর্বে, স্তালিন পর্বে এ অবস্থারই রকমফের দেখা গেছে। কামপুচিয়ার স্বল্পমেয়াদী অভিজ্ঞতা তো আরো রক্তাক্ত, সেগুলিকে আমরা কি বলব? সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ? রাষ্ট্রীয় পুঁজি গড়ে তোলার জন্য পার্টির নেতৃত্বের স্বৈরতন্ত্রী উদ্যোগ? কিংবা অন্য কিছু? লেনিন, স্তালিন এবং সর্বশেষে মাও সে তুং এ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও আধুনিকীকরণের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার নানা বিধান দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণের মধ্য দিয়ে পার্টি কিভাবে সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের পথে আপামর জনগণের সক্রিয় সমর্থন অর্জন করবে তার পথ নির্দেশ করেছেন। কিন্তু যেহেতু বাস্তবে রাষ্ট্র এবং পার্টি আরোপিত সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে তোলার ঠিকা কেবল পার্টি নেতৃত্বের এবং ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে গড়ে ওঠা এক আমলাতন্ত্রের, সেজন্যই ভাত কাপড়ের স্তরেও জনগণতন্ত্রের স্বরূপ জনগণের অনধিগম্য থেকে গেছে। জনগণ ও পার্টির মাঝে এই আমলাতন্ত্র কিভাবে গড়ে ওঠে সে আলোচনা স্বতন্ত্র।

এক-রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে, এমনকি সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্যে দিয়েও কমিউনিস্ট পার্টির ক্ষমতা দখলের অর্থ উৎপাদন সম্পর্কের বৈপ্লবিক বদল নয়। ক্ষমতা দখল পার্টির সামন্ততান্ত্রিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক, পুঁজিতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। অবশ্য দুই তিন দশক সময় যদি রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের কাছে দীর্ঘকাল হিসাবে গণ্য হয়, তবেই। নতুবা খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতন্ত্রীর বিকাশের গোড়ার দিকের দেড় শতকের রক্তাক্ত অধ্যায়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। পুঁজিতন্ত্রের সংশ্লিষ্ট সংসদীয় গণতন্ত্রের আবির্ভাব বিকাশের পথও স্বল্পমেয়াদী ছিল না কোনো রাষ্ট্রেই। এমনকি খোদ ফ্রান্সেই ফরাসী বিপ্লবের পর ঘুগল মার্কা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে হতে সেইন নদী দিয়ে অনেক জল

বয়ে গেছে। গণতন্ত্রের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব দুই শতকের—তুলনায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অর্বাচীন বলা যায় সম্ভবত।

তো, এহেন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণভোট হলে, শতকরা একশোভাগ বা যাদের বৃহত্তর জনসাধারণ বলা চলে তারা গণভোটে সমাজতন্ত্রকেই সবিচার মেনে নিত এমন বলা চলে না। মেনে নিত না তাও হয়ত বলা যায় না। তা ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার হেয়ালী কী আমাদের অজ্ঞাত? ভারতের সংসদীয় নির্বাচন ক্ষেত্রে ভোটদাতার শতকরা সর্বোচ্চ হার ৬৮ শতাংশর কিছু বেশি অর্থাৎ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নয়, ভোটারদের ৩৫ শতাংশই কোনো প্রার্থীকে সংখ্যা গরিষ্ঠতা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কমিউনিষ্ট পার্টি যে রাষ্ট্রে ক্ষমতায় এসেছে, সেখানে গণতন্ত্রী দলের আবির্ভাব ঘটেছে হাল আমলে। তাও ওই পণ্য উৎপাদনের প্রশ্নে, আরও অধিকতর ব্যাপকতর ভোগ্য বস্তুর তীব্র আকাঙ্ক্ষায়। মোদ্দা কথা আধুনিকীকরণের উদগ্র আকাঙ্ক্ষায়, অর্থনীতির ভিন্নতর বিকাশের প্রশ্নে। আর এই ভিন্নতর বিকাশের অর্থ ব্যক্তিমালিকানার বিকাশ। রাষ্ট্রীয় পুঁজির পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানার পুঁজির বিকাশের পথ সুগম করা। সোজা বাংলায় সেটিই গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকা। সেটাই পোল্যাণ্ডে সলিডারিটির যুগোশ্লেভিয়ায় গণতন্ত্রী দলের রাজনৈতিক মতাদর্শের মুখবন্ধ। ব্যালট পেপারে উৎপাদন সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। পার্টিকে জেতানো বা হারানো যায় অবশ্য।

॥ দুই ॥

আমাদের চেনা মুখে যাঁরা এ রাজ্যে ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে (১৯৬২-এর চীন ভারত সংঘাতকে সামনে না রেখেও) সত্তর দশকের প্রায় শেষাবধি বিশ্বপরিস্থিতিতে সম্ভাবিত বিপ্লবের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছিলেন—গোলমাল তাঁদের নিয়ে।

স্তালিন কোসিজিন ক্রুশ্চভ নির্বিশেষে 'রুশ ফাদারল্যাণ্ড' তত্ত্বে যাঁদের অমোঘ বিশ্বাস, গ্লাসনস্ত বা পেরেস্ত্রৈকা তাঁদের তত্ত্বজ্ঞানে খানিক বদহজমের চোঁয়াঢেঁকুর সৃষ্টি করেছে মাত্র। তাঁরা পশ্চিম ইউরোপে সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনাকে 'হজমোলা' হিসেবে গ্রহণ করে পোল্যাণ্ড-হাঙ্গেরি বা যুগশ্লাভিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাসকে স্বস্তিবচন পাঠ করে উপেক্ষা করেছেন। আজারবাইজান কাজাকিস্থান বা তুর্কমেনিস্থানের আপাত বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝুটঝামেলা কিংবা সাম্প্রতিক কোলিয়ারি

শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট, কিংবা খোদ মস্কোতে রুশী কমিউনিস্ট পার্টির সরকারি প্রার্থীর শোচনীয় পরাভব তাঁদের কেমন লাগছে—অজ্ঞাত। কারণ, সত্তর বছরের বিশ্ববীক্ষায় (যা এক অর্থে রুশী চশমায় বিশ্ববীক্ষা) এর কোনো সদুত্তর নেই। নেই-ই। চীনের ক্র্যাক্‌ডাউন এঁদের রীতিমত বিপাকে ফেলেছে, এক এবং একান্ত ভীতিকর এ বিপাক থেকে তাঁরা একটা মুক্তির উপায় পান হয়ত। কিছুটা অভিমান বশেই যেন তাঁরা সমাজতান্ত্রিক চীনের মাও-যুগ স্মরণ করেন। ১৯৪৯ পরবর্তী অধ্যায়ে রুশ-চীন সম্পর্কের আলোচনা এখানে বাহুল্য বিবেচিত হবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে ওই চীন-রুশ সম্পর্কের নিরিখে সমাজতন্ত্রী বিশ্ববীক্ষা ক্রমশ তার আন্তর্জাতিকতার মহান পরিচিতি হারিয়ে, এক অনিবার্য জাতীয় রাজনীতির গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে—এ মন্তব্য সম্ভবত বাহুল্য নয়। সোভিয়েত রাশিয়া সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে চিহ্নিত হলো (আফগানিস্তান থেকে কী শেষ রুশী পদাতিক সৈন্যটি ফিরে গেছে?) চীনের এ কে-৪৭ রাইফেল উঠে এল তৃতীয় বিশ্বের অজস্র দেশের হাতে, পাকিস্তানেও! আমদানি করে সমাজতন্ত্র আনা যায় না এটা সত্য—কিন্তু সমাজতন্ত্র রপ্তানি না করেও রাইফেল রপ্তানি করা যায় এটা প্রমাণিত হলো। সম্ভবত সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণের গুরুত্ব পূর্ণ ক্ষেত্রে অস্ত্র রপ্তানির বিষয়টিকে বাদ দেওয়া যায় না। মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় ঘাটতি, সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ পর্যায়ে আণবিক বোমা বিস্ফোরক কিংবা যুদ্ধাস্ত্র রপ্তানি বিষয়ে বিশদ কোনো বা সংক্ষিপ্ত কোনো তাত্ত্বিক নির্দেশ নেই।

রুশ পিতৃভূমিতে যাঁরা স্থিতপ্রজ্ঞ, চীনা 'ক্র্যাকডাউনকে' পেয়ে বলা যায় তাঁরা গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকাজনিত অস্বস্তির হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁদের কাছে 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' হয়ে উঠেছিলেন, তাঁরা যে খানিকটা হতচকিত, বিহ্বল হয়ে পড়েছেন, এটা বোধহয় নিসংশয়ে বলা যায়। এক্ষেত্রে চীনপন্থী সমাজতন্ত্রী আদর্শ মাও-উত্তর যুগে শতপুষ্পে কুসুমিত না হলেও, পৃথিবী জুড়ে অন্তত একডজন পুষ্পে যে তত্ত্বায়িত এটা নির্দ্বিধায় বলা চলে। ভারতেই অন্তত চোদ্দটি চীনপন্থী নেতৃত্ব এবং সেই নেতৃত্ব সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক বিকাশ ঘটেছে।

যাঁরা এখনও কট্টর মাওপন্থী (এদেশে কোথাও কোথাও বি. জে. পি বা মুসলিম লীগের সংগে নির্বাচনী বা ভিন্নধর্মী আঁতাত সত্ত্বেও) তাঁরা এই ক্র্যাকডাউনে নতুন

করে মাওবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিক্‌নির্দেশ পেয়েছেন চীনে। দেং নেতৃত্ব চীনের সাম্প্রতিক গোলযোগে, তিয়ানানমেন স্কোয়ারের অবস্থানে মাওয়ের আশীর্বাদধন্য 'দুষ্ট চতুষ্টয়' (গ্যাং অব্ ফোর) এবং সাম্রাজ্যবাদী (সন্তবত মার্কিনি) শক্তির যোগ-সাজস খুঁজে পেয়েছেন। অতএব ভারতে, বিশ্বের অন্যান্য দেশে, মাওবাদী নেতৃত্বের চোখে মার্কসীয় তাত্ত্বিকের বিচারে, এ হলো মাওবাদের পুনরুত্থানের শুভ সূচনা। প্রমাণ, তিয়ানানমেন স্কোয়ারে ইন্টারন্যাশনালের সুর ধ্বনিত হয়েছে। অধিকন্তু মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অথবা ফেরারী তালিকায় চিহ্নিত তিয়ানানমেন স্কোয়ার নেতৃত্বের একাংশ এখনও মাওবাদী হিসাবে চিহ্নিত, 'দুষ্ট চতুষ্টয়ে'র ঘনিষ্ঠ। এক হিসাবে এই মাওবাদী তাত্ত্বিক গোষ্ঠী কয়েকটি বিষয়ে বিস্মৃত আলোচনা এখনও করেননি। হয়ত ভবিষ্যতে করবেন। বিষয়গুলি এভাবে উত্থাপন করা চলে—

(১) চীনে এবং তিয়ানানমেন স্কোয়ারে সোচ্চার এই মাওবাদী গোষ্ঠী গত দশ বছর, ১৯৭৮-এর একাদশ পার্টি সম্মেলন থেকে শুরু করে এতাবৎকাল কি করেছিলেন ?

(২) এঁদের সোচ্চার হওয়ার জন্য কি ফ্যাং লি চিন, যিনি স্পষ্টতই মার্কিনী কনসুলেট পুষ্ট, তাঁর এবং মার্কিন তাঁবেদার গোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদত অনিবার্য ছিল ?

(৩) চারটি মৌলিক অধিকারের মধ্যে সমাবেশ করার, বক্তব্য রাখার অধিকার তো ১৯৮১ সালেই চীনা সংবিধানের সংশোধনীতে স্বীকৃত। তাহলে গত এপ্রিল মাসে হুয়া গুও দেংএর (যিনি ইতিমধ্যেই প্রতিবিপ্লবী, মার্কিন সাম্রাজ্য-বাদের তাঁবেদার হিসাবে চিহ্নিত) মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই এঁদের আত্মপ্রকাশ ঘটল কেন ?

(৪) এমত অন্তত একশো প্রশ্ন, অবশ্যই 'বেজিং রিভিউ' পরিবেশিত সংবাদ সূত্র থেকে। পক্ষান্তরে মার্কিনী সংবাদসূত্র কী মাওবাদীরা অনুমোদন করবেন ?

অনস্বীকার্য, আমলাতন্ত্র অধ্যুষিত পার্টির হেডকোয়ার্টার্সে কামান দাগার নির্দেশ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ইতিহাসে নজিরবিহীন। বিশেষত বিশ্বের সর্ববৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান যখন জনগণকে ওই নির্দেশ দেন। এ নির্দেশে আধুনিকীকরণের কাজে জনগণকে শামিল করার আহ্বান ছিল। এটাই সাংস্কৃতিক বিপ্লব।

সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ধারার অনুসারী হয়ে এক দশকে কোথায় পৌঁছাত তা অনুমানের বিষয়। তবে কৃষিভিত্তিক, আধা সামন্ততান্ত্রিক

উৎপাদন কাঠামোয় সমাজতন্ত্র ও আধুনিকীকরণের মেলবন্ধন ঘটাবার বৈপ্লবিক অনুঘটক হিসাবে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের চেয়ে সম্ভাবনাময় উদ্যোগের নজির অদ্যাবধি পৃথিবীতে দেখা যায়নি। এ বিপ্লব কতখানি পার্টি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়ে-ছিল তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু ওই বিপ্লবকে প্রতিহত করতেই গ্রামে গ্রামান্তরে লিবারেশন আর্মিকে নামতে হয়েছিল। মাওয়ের জীবদ্দশাতেই দেং শিয়াও পিং-এর প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল ক্ষমতার দুর্গে। ১৯৭৮ এর মধ্যেই আরেক ক্র্যাকডাউনের মধ্য দিয়ে 'দুষ্ট চতুষ্টয় এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অন্তর্জলী যাত্রা ঘটেছিল।

এমনটা কেন ঘটল ? তবে কি সাংস্কৃতিক বিপ্লব, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পার্টি নির্দেশিত এক গণমুখী বিপ্লব আধুনিকীকরণের ধারণার পরিপন্থী ? আধুনিকীকরণ, এমনকি সমাজতান্ত্রিক দেশে, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বেও, শেষ বিচারে পুঁজি-বাদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারে না ? সাংস্কৃতিক বিপ্লবোত্তর বিগত দশ বছরে গড়ে ওঠা চীনের মুক্ত দুয়ার নীতি কি তাই প্রমাণ করে না ? ক্রুশ্চেভের আধুনিকীকরণের আদর্শ, ১৯৫৬ সালের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতিই কি শেষপর্যন্ত সোভিয়েত সমাজতন্ত্রকে গ্লাসনস্ত, পেরেস্ত্রৈকার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে না ?

দশ বছর আগে চীনে রাষ্ট্রীয় পুঁজি এবং বিকেন্দ্রিত কমিউন, প্রোডাকসন ব্রিগেড বা প্রোডাকসন টিমে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের যে বনিয়াদ ছিল, কার না জানা বিশ্বব্যাংক, মার্কিন পুঁজি, জাপানী কারিগরী বিদ্যার সমাহারে ব্যক্তি-মালিকানা শনৈঃ শনৈঃ বিকাশে এক দশকের আধুনিকীকরণে চীনের সেই সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক অটুট থাকেনি—থাকতেই পারে না। একই কথা সোভিয়েত রাশিয়া সম্পর্কেও প্রযোজ্য। প্রেক্ষাপট বা সময়ের নিরিখে সামান্য তারতম্যকে হিসেবে ধরে নিয়েও যেন প্রত্যক্ষত সমাজতন্ত্র আর আধুনিকীকরণে এক-সঙ্গে চলেনি চলতে পারেনি।

তাহলে কী গত সাত দশকে বৃহৎ শক্তি হিসাবে রাশিয়ার আত্মবিকাশ ঘটেছে ঘোড়ার ঘাস কেটে ! বিশ্বজোড়া পুঁজিতন্ত্রের পায়ে পা দিয়ে খুনসুটি আর ঝগড়া করে ? নয়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ আমেরিকা কমিউনিস্ট চীনকে রাষ্ট্র-সংঘে নিরাপত্তা পরিষদে জায়গা দিয়েছে কেবল চীনের বাজার পাওয়ার জন্য ? গত চার দশকের বিশ্ব ইতিহাসের টানা পোড়েনে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি নেতৃত্বের জোরালো প্রতিরোধী কবজির জোর কী বারে বারে উপলব্ধ হয়নি ?

আর এ সবই সম্ভব হয়েছে দুই দেশেই পার্টি নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশে, বলা ভাল প্রবলতম দ্রুততম বিকাশে।

॥ তিন ॥

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এই অভাবনীয় উন্নতির অবশ্যই রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণ আছে। রাজনৈতিকভাবে ওই সব রাষ্ট্রে ক্ষমতার রাশ কমিউনিস্ট পার্টির হাতে। অর্থনৈতিক দিক থেকে পার্টির লক্ষ্য ন্যূনতম সময়ে কৃষি, শিল্পে স্বনির্ভরতা। সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে প্রাথমিক স্তরে আধুনিকীকরণ এ ভাবেই এগিয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন সম্পর্কের জায়গা নিয়েছে সমবায় রাষ্ট্রীয় খামার। অর্থাৎ যৌথ কৃষি বা রাষ্ট্রীয় কৃষি পার্টির রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে পুঁজিতন্ত্রের আকাঙ্ক্ষিত উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটিয়েছে। যে দ্রুতলয়ে, বিশেষতঃ এই কৃষি বিপ্লব বা ভূমিসংস্কার ঘটে, উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটে, সেই লয়ে পার্টি প্রদত্ত রাজনৈতিক মতাদর্শের তুঙ্গী সংগ্রাম সত্ত্বেও বিশ্বের ওই শিবিরের তাবৎ জনগণের চেতনার রূপান্তর ঘটে না, ঘটতে পারে না। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের দায় যখন রাষ্ট্রের কোনো ব্যক্তিমালিকানার পুঁজির নয় (যা শিল্পবিপ্লবের আন্তর্জাতিক পর্ব থেকে শুরু করে এখন বহুজাতিক বাণিজ্য সংস্থায় রূপায়িত) সুতরাং ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতায় নয়, ব্যক্তির মুনাফাবৃত্তিতে নয়—বিকাশের নিয়ন্ত্রণ এসে পড়ে এক অনিবার্য আমলাতন্ত্রে। মোদ্দা কথা পার্টি ও আমলাতন্ত্র সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক বিকাশের প্রাথমিক স্তরে পুঁজিতন্ত্রী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজটি সমাধা করতে দায়বদ্ধ হয়ে পড়ে।

উৎপাদনের ওই স্তরও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট জাতীয় প্রেক্ষাপটে আধুনিকীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেও আধুনিকীকরণ। ওই পর্বের রাষ্ট্রীয় পুঁজি, পার্টি ও আমলাতন্ত্র নির্ভর উৎপাদন সম্পর্ক কী সমাজতান্ত্রিক? আধুনিকীকরণের প্রাথমিক পট কী সমাজতান্ত্রিক ছিল কোনোভাবে। উৎপাদন সম্পর্কের বস্তুগত বিশ্লেষণে এক্ষেত্রে যতটুকু গোলেযোগ, অনবস্থা তা চাপা পড়েছে অর্থনীতির অগ্রগতির প্রাথমিক সাফল্যে—(সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণে এ সাফল্য আসে ঘোরতর পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও এসেছে) পার্টির প্রচারে।

পার্টির প্রচারের মূলস্তরে শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা নয়, বরং উগ্র জাতীয়তাবাদই ধ্বনিত হয়েছে বারবার। সকারণে অবশ্যই। 'ফাদার ল্যাণ্ড' তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা

করতে গিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া সমগ্র ইউরোপ আর আমেরিকাকে জাতীয় শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করেছে। চীন মর্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সোভিয়েত সামাজিক সাম্রাজ্যবাদকে। সর্বদাই অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে একটা জরুরি অবস্থার বাতাবরণ রাখা সম্ভব—যেখানে পুঁজি, রাষ্ট্রীয়, ক্ষমতা একপার্টি-কেন্দ্রিক এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, সম্ভবত আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা। এ অবস্থায় উৎপাদন বাড়ে, কেননা এই সময়ে আমলাতন্ত্র তার ক্ষমতা বিকাশ করতে সক্ষম হয়ে বলে। সুতরাং বহিঃশত্রুর আক্রমণ সম্ভাবনার সম্মুখীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পার্টি এবং আমলাতন্ত্রের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় পুঁজিনির্ভর এক গণ উদ্যোগ তৈরি করতে পারে। হুবহু এক না হলেও এমত জরুরি অবস্থায় উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের নমুনা পৃথিবীর বহুদেশেই দেখা গেছে—সম্ভবত ভারতেও। এভাবেই চীনে ইস্পাতবিপ্লব—এমনকি লেনিনের সমাজতন্ত্রের অর্থ সোভিয়েট-প্রয়োজনীয় ইলেকট্রিসিটির অনুধাবনযোগ্য।

লেনিন থেকে মাও পর্যন্ত কমিউনিস্ট নেতৃত্ব সর্বদাই রাজনৈতিক মতাদর্শের সংগ্রামকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের বাস্তব অবস্থাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছেন, আঘাত করতে চেয়েছেন প্রতিনিয়ত, যাতে রাষ্ট্রীয় পুঁজি—আমলাতন্ত্রনির্ভর অর্থনীতির মূল কাঠামো কোনোমতেই উপরি-কাঠামো রাজনৈতিক মতাদর্শের ঘাড়ে চেপে না বসতে পারে। এটাকে নিশ্চিত করার জন্যেই পার্টি নেতৃত্বের পরিসরকে বিস্তৃততর হতে হয়েছে; যাতে কেবল শ্রমিক শ্রেণী, ক্ষুদ্র মাঝারি কৃষক এমনকি অল্পস্বল্প নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি মালিকানা, শিক্ষক-ছাত্র সবাই একযোগে শ্রেণীসমন্বিত এক পার্টি গড়ে তুলতে পারে। রাষ্ট্রীয় পুঁজিকে জোরদার করতে গেলে আমলাতন্ত্রনির্ভর উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ঘটাতে গেলে সোভিয়েত রাশিয়া বা চীনে কি অন্য পন্থা ছিল? বোধহয় ছিল না।

এভাবে কালক্রমে শ্রমিক শ্রেণী (নির্ভেজাল মার্কসীয় শ্রমিক শ্রেণী, যাঁদের শ্রম কমোডিটিতে পরিণতি পেয়েছে পুঁজিতন্ত্রের মাধ্যমে) আর পার্টির নিরঙ্কুশ নেতৃত্বে থামছে না। পার্টির নিয়ন্ত্রণে আসছেন বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, ছাত্র, মধ্যস্বত্বভোগী আমলা, সরকারি কর্মচারী প্রভৃতি। ব্যক্তি মালিকানার ক্ষুদ্রতম উপস্থিতিও এখানে ভয়াবহ, কিন্তু তার উপস্থিতি ছাড়া উৎপাদিকা শক্তির আকাঙ্ক্ষিত বিকাশ ঘটছে না।

ভোগ্যপণ্য উৎপাদন যেখানে আধুনিকীকরণের মূল লক্ষ্য, সেখানে মুক্ত গণতন্ত্রী আবহ রচিত হয়ই। স্বাভাবিক চীনে আজ অর্থনৈতিক অপরাধ সীমাহীন,

লুণ্ঠন, ধর্ষণের ঘটনা নৈমিত্তিক। এমনকি ড্রাগের বিষাক্ত নেশা দ্রুত প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। স্বজনপোষণ এবং দুর্নীতিতে পার্টি এবং আমলাতন্ত্র আচ্ছন্ন। গত এপ্রিল থেকে ৪ঠা জুনের ক্র্যাকডাউন পর্যন্ত সেজন্য সরকারি দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিয়ানানমেন স্কোয়ারে বিক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে।

লক্ষণ মিলিয়ে, দুর্নীতির ঊর্ধ্বগতি দেখে সাম্প্রতিক সময়ে অর্থনীতির বিকাশের ধারা কেবল কমিউনিস্ট পার্টি বলছে বলেই, সমাজতান্ত্রিক—মেনে নেওয়া শক্ত। বস্তুতঃপক্ষে মার্কিন পুঁজি, বিশ্বব্যাঙ্ক, জাপানী প্রযুক্তি, দীর্ঘমেয়াদী পর্বে পার্টির নিয়ন্ত্রণ মেনে চলবে, অতিবড় আশাবাদীও তেমন আশা পোষণ করেন না। প্রশ্নটা যেন আজ এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে সমাজতন্ত্র না আধুনিকীকরণ।

পণ্য উৎপাদন যদি সমাজতন্ত্রের মোক্ষ হয়, তবে উৎপাদন সম্পর্ক বা উন্নয়নের পদ্ধতিগত প্রশ্ন কি শিকেয় তোলা থাকবে? অর্থনীতির মূল তত্ত্বগুলো, মার্কসীয় তত্ত্বগুলো কি লেনিনবাদ স্তালিনবাদ মতবাদের আলোকে বর্তমান পরিস্থিতিতে নতুন ভাবে বিচার্য হয়ে উঠছে না।

সমাজতান্ত্রিক আধুনিকীকরণ কিভাবে সমাজতান্ত্রিক থাকবে এটাই কি ফলিত মার্কসবাদের কেন্দ্রীয় ভাবনা নয়?

প্রাসঙ্গিক সহায়তা

১। অনুষ্টুপ, শারদীয়া ১৩৯৬
২। মার্কস থেকে মাও সে তুং—জর্জ থমসন্
৩। ক্যাপিটালিজম এণ্ড আফটার—ঐ
৪। সোভিয়েত মার্কসিজম্—হার্বার্ট মার্কুস
৫। ফাইভ লেকচারস (শেষ অধ্যায়)—ঐ
৬। জার্মান ইডিওলজি—মার্কস এঙ্গেলস্
৭। এসেজ অন সোসিওলজি অফ কালচার—কার্ল মানহিম্
৮। চায়না আফটার মাও—(বেজিং রিভিউ-এর রচনা সংগ্রহ)
৯। চায়নাজ সোস্যালিস্ট ইকনমি—জু মু কিয়াও
১০। এছাড়া বেজিং রিভিউ-এর এপ্রিল থেকে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত প্রকাশিত সাময়িকীগুলি—প্রয়োজনীয় তথ্যর জন্য। বহু তথ্য ইতিমধ্যে বহুল প্রচারিত বলে, এ প্রবন্ধে পুনরাবৃত্ত হলো না। তথ্যের জন্য অনুষ্টুপে বিশেষ ক্রোড়-পত্রটি (উপরে ১নং) দেখা যেতে পারে।

মিউজিয়ামের পিস্তল

কমল চক্রবর্তী

সিন্ধু বেলা দশটায় বাড়ি ফিরে দেখল রীণা বিষ খেয়েছে। দেখে মরা মনে না হলেও মৃত্যুর যাবতীয় রহস্য রীণাকে ঘিরে। সে প্রায় কোনই লড়াই দিচ্ছে না, তাই আরও দ্রুত স্পন্দনহীন হয়ে যাচ্ছে।

রীণা! রীণা! এ তুমি কী করলে? সিন্ধু রীণার স্পন্দনহীন শরীরের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

রীণা কথা না বললেও খুব চেষ্টা করে টেবিলের দিকে দেখাল, যেখানে চাপা দেওয়া তার শেষ লেখা 'মৃত্যু আমার প্রিয়, উপভোগ করছি'। 'মৃত্যু আমার প্রিয়' সিন্ধুর পুরস্কৃত কাব্যগ্রন্থ। বছর দশেক আগে প্রকাশিত। রীণার খুব প্রিয়।

সিন্ধু ডাঃ বোসকে ফোন করল। লেখার টেবিলের সবচেয়ে নিচের ড্রয়ারটা টানল। পরপর তিনটি ড্রয়ার। ওপরেরটি আধ খাওয়া, এক কামড় খাওয়া অথবা গোটা টুকটুকে আপেলে ভর্তি। সিন্ধু ঐ ঈষৎ পচা আপেলের গন্ধে লেখায় বুঁদ হয়ে যায়। কখনও লিখতে লিখতে এক কামড় আপেল খেয়ে নেয়। পাঁচ সাত-দিন পরে রীণা পুরোনোগুলো ফেলে দেয়। ফের নতুন ড্রয়ারে ভরে রাখে, কখনও এমনও হয়েছে আপেল না থাকার জন্য বিরক্ত সিন্ধু লেখা বন্ধ করে মন্থে স্নান করে উঠেছে।

দ্বিতীয় ড্রয়ারে রয়েছে অসংখ্য পুতুল। নানা সাইজের। রাজা রানী হাতি ঘোড়া, ক্যাঙ্গারু, পেঙ্গুইন। কেবল এদেশের নয়, সারা পৃথিবীর পুতুল ওয়ালাদের থেকে সিন্ধুর সংগ্রহ। রঙবেরঙের পুঁচকে পুঁতুল। নিজে তো কম ঘোরেনি, যেখানে গেছে। ঐ এক নেশা, পুতুল খেলা, বড় নয়, ছোট ছোট, যাতে দ্বিতীয় ড্রয়ারের

ছোট সাম্রাজ্যে স্থান পায়। কেউ বাইরে গেলে বলে দিয়েছে, আমার জন্য পুতুল এনো।

কখনও পচা আপেলের গন্ধে বুঁদ, ছোট ছোট পুতুলে টেবিল সাজিয়ে নানা রকম দেশ তৈরি করে সিন্ধু খেলে। তারপর নির্মাণের ঐশ্বর্যে ডুবে যায়। কারণ দেশী তো বটেই বিদেশী বহু পুরস্কারে সে এখন জীবন্ত বিগ্রহ। সাহিত্য জগতের একক ঈশ্বর। মাত্র উনপঞ্চাশ। এত কম বয়সে সিন্ধু যেখানে উঠেছে গত দেড়শ বছরের সাহিত্য ইতিহাসে খুব ভেবে দেখতে হবে, আর কেউ গেছে কিনা।

তৃতীয় ড্রয়ারে ব্যক্তিগত টুকিটাকি, একটা পিস্তল এবং কিছু কাগজপত্র। পিস্তলটার একটা ইতিহাস আছে, বছর দশেক আগে পুজো সংখ্যায় প্রকাশিত উপন্যাস 'ন্যাকড়া' পড়ে এক কালের প্রচণ্ড নকশাল পন্থী অনিমেষ বক্সী বাড়িতে দেখা করতে আসে। সঙ্গে একটি চাইনীজ পিস্তল, দশটি তাজা গুলি। দিয়ে যায়। নকশাল নিয়ে এমন মর্মান্তিক লেখা আর কেউ লিখতে পারেনি, অনিমেষ সামান্য দু একটা কথা বলে। চা না খেয়েই সিন্ধুকে বলে, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ, আপনি আমাদের পাল্‌স্ ধরতে পেরেছেন। অহেতুক করুণা দেখাননি। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ জিনিসটা আপনাকে দিলাম। অন্য কেউ হলে আপনাকে ফুল দিত, আমার তরফ থেকে এটা রাখুন। পরে কখনও কাজে লাগবে। সামান্য উপহার।

ছেলেটি পিস্তল ব্যবহারের রীতি নীতি শেখায় এবং সাইলেন্সার লাগান যন্ত্র থেকে একটি বুলেট ছুটে গিয়ে হাত কুড়ি দূরে সারাণ্ডা থেকে আনা কিম্ভূত জন্তু আকৃতির গুঁড়ির ঠিক চোখে হিট করে। সিন্ধু চেয়ার থেকে লাফিয়ে ওঠে। ভয়ে, মানসিক চাপে জর্জরিত সে ভাষাহীন হয়ে যায়, অনিমেষ আর একটা কথাও না বলে টেবিলে শীতল আগ্নেয়াস্ত্রটি নামিয়ে ফিরে যায়।

পরে এসব শুনে নিখিল বলেছিল, একেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। তো পিস্তলটা কি করলি?

কি আবার করব, এক হাতে গীতা অন্য হাতে রুমালে জড়িয়ে সোজা গঙ্গায়। ও বস্তু কি ঘরে রাখা যায়? পাগল!

আসলে সিন্ধু পিস্তলটা ফেলতে পারেনি। ভেবেছিল মাত্র। অনিমেষ চলে গেলে সে বহুক্ষণ ধরে ঘামতে থাকে এবং ভেতরের শুকিয়ে যাওয়া শিরা উপশিরার ধ্বংস টের পায়।

চলৎশক্তিহীন সে বহুক্ষণ পরে প্রথম ড্রয়ারটি খোলে এবং দমকে পচা

আপেলের মিষ্টি অথচ ঈষৎ মাদক, কিছুটা কটু গন্ধ গোটা ঘরের হাওয়ায় খেলে যায়। সে চাঙ্গা বোধ করে। এবং সিগারেট ধরাতে পারে। উঠে সোজা সেই মার খাওয়া গুঁড়ির কাছে যায়। যেখানে অনিমেষের বুলেট দীর্ণ করেছিল চোখ, সত্যি কথা বলতে কি ভালই লাগে, কিম্ভূত জন্তুর চোখে থেকে বেরিয়ে থাকা বুলেটের শেষাংশ স্পর্শ করে খুশিতে মন ভরে যায়।

সিন্ধু একটা ঘর আলাদা করে মিউজিয়াম তৈরি করেছে। যেখানে যাবতীয় উপহার। স্প্যানিশ যুবতীর দেওয়া বিশাল স্ট্র হ্যাট থেকে কানাডিয়ান বন্ধুর দেওয়া স্লেজ গাড়ির হুক। কি সেখানে নেই! আন্দামানের ছেলেরা একবার রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নিয়ে গিয়েছিল। উপহার দিয়েছিল জারোয়াদের বিষ-তীর আর ধনুক, আদিম সেই তীর এবং ধনুক সত্যই দুর্লভ। সিন্ধু সেদিন নিজেকে নব্য ভারতের ভাষা বাস্তকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল, এবং মনে মনে স্বীকৃতি দিয়ে ফেলে যে রবীন্দ্রনাথের পর এত বড় প্রতিভা এদেশে আর আসেনি।

কানাঘুষোয় আরম্ভও হয়েছিল কথাটি। কিম্বা কখনও কি ভুলবে পাপুয়ার সেই খয়েরি মেয়েটিকে, যে এক দুপুরে নিজে ভেলা চালিয়ে বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক আনন্দ, স্বপ্নের মুহূর্ত রচনা শেষ হলে হাতে তুলে দিয়েছিল চুনি পান্নায় সাজানো পূর্ব-পুরুষের করোটি।

—কবি এই আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তোমায় দিলুম, তুমি দারুণ কবিতা লিখেছ! এমন মহান প্রেমের কবিতা আমি কখনও পড়িনি, তোমাকে আমার শ্রেষ্ঠ দিলুম। যেন ওকাম্পোর সামনে রবীন্দ্রনাথ।

সেদিন বিদায়বেলায় ফের মেয়েটি গাঢ় কফিরঙা নরম ঠোঁটে চুম্বন করলে সিন্ধুর চোখে জল এসেছিল। সত্যি কি সে এতই বড়, এত মহান?

আসল নাম তো সিন্ধু নয়, ব্রজবাসী, ঠাকুমার দেওয়া। ব্রজবাসী সেন নামেই গোড়ারদিকে কিছু কবিতা প্রকাশিত হবার পর একদিন অমলদা ডাকেন।

—এই যে ব্রজ, কটা কবিতা প্রকাশিত হলো?

—সাতটি; কড় গুনে ঈষৎ লাজুক ব্রজবাসী বলেছিল।

—এই অব্দি ঠিকই আছে। লিখছোও ভাল, তবে ঐ ব্রজবাসী নামে কিন্তু বেশি দূর এগোনো যাবে না। একটা যুৎসই ছদ্মনাম নাও।

—ছদ্মনাম! ব্রজ আঁতকে উঠেছিল, ছদ্মনাম! বাবা-মার দেওয়া নাম যতই তামাশার হোক এতদিন অভ্যস্ত, বদলানো সম্ভব কি? অনেক ভেবে বলেছিল,

—কি নেব অমলদা? ধৃতরাষ্ট্র? অষ্টমুনি? সিন্ধুবাদ? ঝরাফুল? বেশ আন্তরিক ভাবেই একটার পর একটা নাম বলে বলে ব্রজ সেদিন আগামী জীবন অনুরঞ্জিত করতে চেয়েছিল। শত হলেও নিজেরই নাম। যে নামে সে একদিন জগৎ জোড়া হবে।

অমলদার হো হো হাসিতে একুশ বছরের ব্রজ কর্ণুরের মতো উবে গিয়েছিল।

—আরে পাগলা, কবিতায় ছদ্মনাম ধৃতরাষ্ট্র বা ঘটোৎকচ চলে না, ওসব ঢাউস উপন্যাসে চলে ব্রাদার। দাঁড়াও এক কাজ কর, ঐ 'সিন্ধুবাদ' থেকে বাদ উড়িয়ে দাও। সিন্ধু সেন ঢালাও এলিটারেশনও হলো। কি পছন্দ? এক্কেবারে বিষ্ণু দে-র মতোই শোনাচ্ছে। নতুনও হলো।

মুখে কিছু না বললেও ব্রজ ততক্ষণে বিখ্যাত 'সিন্ধু সেন' হয়ে পড়েছিল, এবং সিন্ধু সেন বস্তুত সিন্ধুবাদ নাবিকের মতই একের পর এক দুনিয়া জিতে নিল। একজন প্রকাশক বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, যেমন গাভাসকারের দশ হাজার রান, যেমন কপিলের তিনশ উইকেট তেমনি সিন্ধু সেনের পাঁচশ গ্রন্থ কেবল বাংলায় নয় ভারত তথা এশিয়ার গৌরব, এবং সিগারেট হাতে সিন্ধু সেন পরের পর ফ্রিজ, কেচাপ, বেনারসী এবং হেয়ার রিমুভারের বিজ্ঞাপনে ছবি হয়ে যেতে থাকে।

আজ অনেক দিন পরে তৃতীয় ড্রয়ার যেটা পিস্তলের গোপন গুহা এবং সামান্য কিছু কাগজপত্র, খুলল। এইখানেই আত্মহত্যার শেষ চিঠিগুলি রয়েছে। আজকেরটি বাদে আরও চারটি। নানা বয়েসী রীণার নানা আবেগে লেখা স্বীকারোক্তি। কখনও এক লাইন কখনও তিন লাইন কখনও এক পাতা।

অন্য চিঠিগুলিও সিন্ধু আজ একবার পড়বে। পড়ার আগে অনেকদিন পরে পিস্তলের মসৃণ শরীর নিয়ে একটু খেলতে ইচ্ছে করল। অনিমেষের শিখিয়ে দেওয়া। গুলিভরা, গুলি খালাস করা, কিছুক্ষণ, একচোখ টিপে দেওয়ালে যামিনী রায়ের ছবির কৃষ্ণাকে তাক করল। এবং ওপরের ড্রয়ারটা খুলে পচা আপেলের গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরময়, পচা অথচ মিষ্টি।

অনেকবার পিস্তলটা ফেলে দেবে প্ল্যান করেও ফেলতে পারেনি, গঙ্গার ঘাট অবধি নিয়ে ফেরত এনেছে। অথচ এই আপাত অকেজো যা কখনো ব্যবহার করা যাবে না। শান্ত শিলীভূত আগ্নেয়াস্ত্র, অথচ মনে পড়লে একটা বেআইনি ভয়, কেন পোষা? শেষে পিস্তল নামে তিন চারটে কবিতা লিখে ফেলে। একদিন একটা কবিতা সন্ধ্যা থেকে বেরচ্ছে, সেই অনিমেষের সঙ্গে লাউঞ্জেই দেখা—এইজন্য

আপনাকে ভালবাসি, শ্রদ্ধা করি। দারুণ লিখেছেন। এবার একদিন গিয়ে একটা 'হ্যাণ্ড কামান' দিয়ে আসব।

অনিমেষ হয়ত মজা করেই বলেছে; কিন্তু দিনকয় সিন্ধুর ঘুম উঠে গিয়েছিল এই আসে এই আসে, সারাক্ষণ ভয়। একটা দুঃস্বপ্নের হ্যাণ্ড কামান সর্বদা মাথা হেঁট করে ভাবনায় ঝুঁকে থাকত। কখনও ধূমধাড়াক্কা গোলা বর্ষণ করত। তারপর কখন সব ভুলে গেছে।

রীণাকে কখনও পিস্তলের কথা বলেনি। এমনিতেই ও ভীতু, আবেগপ্রবণ। প্রথমে হয়ত ভয় পাবে কাঁপবে, কিন্তু শেষে একদিন ঘরে ফিরে দেখবে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রে বিখ্যাত সাহিত্যিকের স্ত্রীর মৃত্যু।

কিন্তু মধুশ্রীকে দেখিয়েছিল। হিমাংশুদের সঙ্গে রীণা পুজোর মাস দুই আগেই পুরী গেল। এই সময়টা নাওয়া খাওয়াও ফট্ হয়ে যায়। রীণার সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা। সারাক্ষণ পচা আপেল ছড়িয়ে মগ্ন সিন্ধু পাতার পর পাতা ভরে যাচ্ছে। সেই সব বোরিং দিনেই একদল পুরী যাচ্ছিল। রীণা ওদের সঙ্গে গেল। এই ফাঁকে ওৎ পেতে থাকা মধুশ্রী রাত এগারটায় সিন্ধুর ফ্ল্যাটে একদিন উঠে এল। পর পর তিনদিন এসেছিল।

—তুমি রাষ্ট্রীয় সম্পদ সিন্ধু! তোমাকে আমি যেমন খুশি ব্যবহার করব, নিষেধ করতে পারবে না। তোমাকে একটা মেয়ে মানে তোমার বৌ বগলদাবা করবে ভাবতে পারো! খিলখিল হেসে মধুশ্রী মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ে অসংখ্য পাগলা মৌমাছিকে তাড়া করেছিল।

—এ কথাটা কজন বোঝে? তোমার বোধোদয় হয়েছে তাই রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিয়ে আনন্দ করছ, অথচ দেখ অপেক্ষা করে থাকি। সারা ঘরময় পুজোয় লিখতে চাওয়া উপন্যাস গল্প কবিতার অসমাপ্ত উড়ো পাতা। আপেলের ফেলে যাওয়া গন্ধ।

—দাঁড়াও আগে তোমায় সাজাই, এই বলে বসে থাকা সিন্ধুর গা থেকে একে-একে সমস্ত পোশাক খুলে নিয়েছিল।

—এটা আবার কিরকম সাজানো হলো? এ তো রীণা রোজ সাজায়, হেসে সিগরেট ধরিয়েছিল সিন্ধু।

—দাঁড়াও এখনো হয়নি, সবে শুরু।

সিন্ধুর দু হাত চুলের ফিতে দিয়ে শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিল। তারপর বুক থেকে ব্রা খুলে দু পা শক্ত করে বেঁধে ফেলে। অদ্ভুত এক প্রস্তুতাত্ত্বিক হাসি ছড়িয়ে

পড়ে সিন্ধুর মুখে। এরপর শাড়ি, ব্লাউজ, পাজামা, পঞ্জাবি, জাঙিয়া সায়া খুলে পাশে স্তূপাকার। মধুশ্রী দেশলাই দিয়ে ঐ ব্যবহৃত পোশাকে আগুন জ্বালায়। আগুনের লকলকে লাল শিখা। মধুশ্রী ড্রেসিং টেবিলে সাজতে বসে। দু হাত পা বাঁধা সিন্ধু ওঠার চেষ্টা করে না, সে আদিম স্বচ্ছ এক মানব, যে এইমাত্র হরিণ শিকার করে ফিরেছে। শরীরে হরিণের তাজা গরম রক্ত লেগে। পাশে ঐ আগুনের ধারে সহচরী গরম হরিণের মাংসে মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছে মধুশ্রী উঠে দাঁড়ায়। তার শরীরের রক্তিমের সঙ্গে আগুনের রক্তাভার কোটি কোটি ফুল ঝরে পড়ে। মধুশ্রী হেসে বলে, সিন্ধবাদ, তুমি আমার নাবিক সিন্দবাদ, বলেছিলুম আজ তোমায় সাজাব, দেখ সেজেছ কিনা। দেখ।

এই বলে বন্দী সিন্ধুকে বড় আয়নার সামনে অসুবিধে করেই নিয়ে আসে। চলতে গিয়ে ব্রা-য়ের ইলাস্টিক খানিক সম্প্রসারিত হয়ে সাহায্য করে। তখনও আগুন নেভেনি। হাত খোলা পেয়ে সিন্ধু প্রথমেই পিস্তলটা নিয়ে আসে। এবং আগুনবর্ণ স্তূপ চেপে ধরে—এবার মল্লিক মশাই! এবার যদি আপনার মুণ্ডুটা উড়িয়ে দেই কি করবেন কন?

নলটা ওপরে তুলে দিতে দিতে মধুশ্রী বলেছিল, প্যালারাম ইটা মুণ্ডু লয় গো বাবু। মুণ্ডু এক চিন্তা উপরে বটেক! ইটা ঝুম ঝুমি।

ওহ্ কি দুর্দান্ত! এরকম একটা গল্প যদি সে লিখতে পারত! পরে অবশ্য, লিখেছিল 'পাতাল বসন্ত'।

কত মেয়ে কত দিয়ে গেছে। কেবল রীণা নিয়ে গেল, প্রথম আত্মহত্যার চিঠিতে লেখা "আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়"। সেবার সবে গায়ে, জামা কাপড়ে কেরোসিন ঢেলেছে। বর্ষাকাল লক্ষ্য করেনি, দেশলাই ঘষে ঘষে শেষ, বাজার থেকে ফিরে সিন্ধু দেখল, রীণার চোখ লাল, কেরোসিনের উগ্র গন্ধ। ধীরে ধীরে সিন্ধু সমস্ত টের পেল, তারপর রীণার সেকি কান্না! আমি মরতে পারলুম না!

—কেন তুমি মরবে! মরা কি উচিত? ছিঃ ছিঃ! তোমার কিসের দুঃখ!

—না সিন্ধু আমার কোনো দুঃখ নেই বলেই মরব।

—এ সব কি? তোমাকে সাইকিয়াট্রিস্ট দেখানো দরকার।

—সিন্ধু আমি মরতে চাই না। একটু পরেই স্বর পালটে গেল।

—বুঝতে পার না, তোমাকে ছাড়া আমার চলবে না? তোমার জন্যই আমার এত খ্যাতি। সব্বাই জানে তুমি ব্যাকগ্রাউণ্ডে আছো বলে আমার এত রমরমা।

প্রত্যেক বিখ্যাত মানুষের স্ত্রীই ছিলেন তার সাকসেসের আসল চাবিকাঠি। আর তুমি মরে গিয়ে আমার চাবিকাঠি হারিয়ে দিতে চাও?

—না আমি শুধু তোমার জন্যই বাঁচব সিন্ধু।

এক বছর পরে দ্বিতীয় চেষ্টা। আপাত দেখলে বোঝা যাবে না। সিন্ধু রীণার আত্মহত্যার ইতিহাস জানে বলেই ধরে ফেলেছিল। পরে অবশ্য রীণাও স্বীকার করেছিল এবং হ্যাণ্ডব্যাগ খুলে স্বীকারোক্তির চিঠি দেখিয়েছিল।

ব্যাপারটা হয়েছিল কি, পুরী ভ্রমণের তৃতীয় দিনে রীণা কোনো নুলিয়া না নিয়েই জলে নামল। এই গর্জাস আরম্ভ দেখেই পাড়ে ধুতি পাঞ্জাবি পরা সিন্ধু নতুন করে হুইটম্যান পড়ছিল, চমকে উঠল, দেখল হঠাৎ যেন ঢেউগুলি আকাশ ছোঁয়া হয়ে আসছে, ফলে খুবই মামুলি সাবধানী—রীণা আর যেও না, উঠে এসো। নুলিয়া নাওনি কেন? অত সাহস ভালো না!

গর্জনে এসব কথা শোনার নয়। বরং ঢেউ আরও বড়ো হল। রীণা দুঃসাহসী ঢেউ-এর চূড়োয় উঠে বসল। ভয়ঙ্কর ঢেউ-এর মধ্যে নীল ও শাদা ফেনায় তলিয়ে যেতে লাগল। হাসতে হাসতে কখনও সর সর করে বেলায় আছড়ে পড়ল, কিন্তু কতক্ষণ? মিনিট দশেক পর ঢেউ-এর ফণা থেকে সোজা গহ্বরে। আর রীণাকে দেখা গেল না। বই ফেলে হতচকিত সিন্ধু জলের ধারে। আশপাশে পাঁচ ছটি যুবক খেলছিল। তারা কি করে যেন মিনিট তিন চার পর কাটা ঘুড়ির সুতো টেনে গুটিয়ে ফেলার মতো করে রীণাকে পাড়ে তুলল। রীণার কাপড় তখন কোমরে গুটিয়ে গেছে। ব্লাউজের খোলে বালি, চোখমুখ দিয়ে তরতর করে স্যালাইন ওয়াটার পড়ছে।

সী বীচ-এ আলোচ্য হয়ে পড়ল। এবং সে যে বিখ্যাত লেখক সিন্ধু সেন এ খবরও পৌঁছে গেল। ওহ্ সহ্য করা যায় না। ভয়ে, দুঃখে আড়ষ্ট হয়ে গেলেও ভেতরে একটা ক্রোধ ঘৃণা খেলে যায়। সিন্ধু অনেকবার রীণাকে নুলিয়া ছাড়া নামতে নিষেধ করেছিল। এ সত্যি আজ অনর্থক।

আসলে রীণা হ্যাণ্ডব্যাগের চিঠিটা আগের দিন গভীর রাতে, সিন্ধুর ভালবাসা ক্লান্ত শরীর ঘুমিয়ে পড়লে লেখে—'তোমাকে ছেড়ে গেলুম তার মানে এই নয় যে তোমার কষ্ট বুঝিনি, আমার চলে যেতে আরও বেশি ভালো লাগছে, এই স্বার্থপরতা। আমার সম্পূর্ণ দায়িত্বে আমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলুম। ঢেউ ও তোমার মধ্যে ঢেউই আদিম ও দারুণ।'

এই চিঠি পড়ে তো বোঝাই যায় রীণাও একসময়ে কবিতা লিখত বা চেষ্টা করত। না হলে মৃত্যুকে ভালবাসা! এমন নয় যে তার কোনো অসুখ আছে বা তাকে সিন্ধু কম ভালোবাসে বা কম অর্থ বা প্রতিপত্তি।

সেই একবার মাত্র আত্মহত্যা-ইচ্ছুক রীণাকে সিন্ধু ঘনিষ্ট ভাবে দেখে, কিভাবে সে পরের পর সিঁড়ি ভাঙছে। ঢেউ-এ দোল খেতে খেতে ক্রমাগত আরও দুর্মর রন্ধ্রে যেখান থেকে সরু লিকলিকে লক্ষ্য লক্ষ্য কালো জিভ বেরিয়ে আসে যা অবলীলায় রীণার ফর্সা মসৃণ পায়ে জড়িয়ে যায়। সমুদ্রের নীল মশারি তাকে টেনে নিয়ে যায় মৎস্যকন্যা করবে বলে। তবু কি করে যেন উৎসাহী যুবকেরা সেদিন সিন্ধু সেনের অতৃপ্ত কামিনীকে তীরে ফিরিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় মৃত্যুর মহড়া চোখের ওপরে দেখতে দেখতে লেখক দুঃখী হয়ে যায়। এবং সে অসমাপ্ত ভ্রমণ রেখে ঘুষ দিয়ে পরের দিনের ফিরতি রিজারভেশন সংগ্রহ করে। স্যালাইন পুষ্ট রীণা সারা রাস্তায় একটাও কথা বলে না।

অস্ট্রেলিয়ায় পোয়েট্রি ওয়ার্কশপে গিয়ে সুজি মেয়রের সঙ্গে ঘনিষ্টতা হয়। বাইশ বছরের সুজি মেয় ইণ্ডোলজির ছাত্রী। ভাঙা বাংলা জানে। 'সিলেক্টেড পোয়েমস্ অব সিন্ধু' এই নামে ওখানকার বিখ্যাত পাবলিশার্স কেরুম্যান গ্রন্থ প্রকাশ করে। অনুবাদ সুজির। সিন্ধু কেবল বাংলা বইটা দিয়েই চলে এসেছিল। সুজি বলেছিল, —কবি এভাবে অনুবাদ করা যায়? তোমাকে দাও। পাপুয়া নিউগিনি নিউজি-ল্যাণ্ড। সেই সময়।

—তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি একা। সত্যিই কি তাই? তুমি কি বিয়ে করনি? সুজি নারকেল কুঞ্জের নিভৃত ছায়ায় গণ্ডোলায় দোল খেতে খেতে সেদিন চোখে জল এনে দেয়।

—হ্যাঁ—সিন্ধু তার সমুদ্রমুখী দৃষ্টি, না ফিরিয়েই বলেছিল। অথচ ঘরে তার ঐশ্বর্যময়ী স্ত্রী, শান্তিনিকেতনে আট বছরের কন্যা।

—তোমার কোনো বান্ধবী নেই? সুজি মেয়র আর থাকতে পারেনি। সদ্য অনূদিত কবিতা থেকে একের পর এক পড়ে গেছে—দেখ দেখ কি লিখেছ, তোমার রত্নদ্বীপের প্রবেশাধিকার কাউকে কোনোদিন দেবে না? কেন? কেন? সিন্ধু? ও ইউ নটি সিন্দবাদ!

মাওরি যুবতীরা তখন বাণবিদ্ধ মাছ নিয়ে ফিরছিল, নীল জলরাশি অতিক্রম করে যাচ্ছিল মেঘ ও ইচ্ছামৃত্যু পাখির দল।

সিন্ধু ভেবেছিল কি সে বাংলা কবিতা লিখেই এত বড়ো পৃথিবীর নিউগিনি তীরে সোনা রৌদ্রবেলায় স্নান করবে! এই বোধ তাকে আরও একা করে দেয়। পৃথিবী থেকে ছিন্ন করে। মনে পড়ায়। এক আষাঢ় রাতে বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি ব্যালকনিতে লাগান রজনীগন্ধার ডাঁটি ভরে গেছে সুগন্ধে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল মধ্যরাত। সে বাথরুম ফেরতা দেখল বসার ঘরে আলো জলছে। এবং আরও এগিয়ে দেখল, রীণা। ব্যালকনিতে রীণার একটা বাগান, সেখানে যেমন টব আলো করে থাকে টমাটো সূর্যমুখী লঙ্কা তেমনি চন্দ্রমল্লিকা বুনো লতা, ক্রোটন, ক্যাকটাস, নানা এতোল বেতোল গাছগাছড়া, থানকুনি পাতা, ঢেঁকির শাকও পাওয়া যাবে। যত্ন করে।

ঐ গভীর রাতে যখন আষাঢ়ের মত্ত পৃথিবী, নিচ থেকে ব্যাঙের ঘ্যাঙর ঘ্যাং পাঁচতলা অব্দি ভেসে আসছে। চারধার ঘুমন্ত। রীণা থানকুনি পাতার টবে উঠে দাঁড়িয়েছে। কারণ রেলিঙের উচ্চতাজনিত বাধাঁ, টবটা ভেঙে মাটি এবং লতা ছড়িয়ে পড়ল, ভ্রূক্ষেপ নেই, একটা ঘোর রীণাকে টানছে, পেছন থেকেও বোঝা যায়।

সিন্ধু আস্তে আস্তে পেছনে এসে দাঁড়ায়। রীণা নতুন একটা টবে উঠে দাঁড়িয়েছে, না, দু টবে দু পা রেখেছে। রীণার শরীর তো খুব একটা হালকা নয়। যদিও সে হালকা থাকার জন্য ফল ও দুধের উপর নির্ভর করে। প্রায় কোনো কোনো দিন রাতেও ভাত রুটি খায় না, মিষ্টি ফল আর দুধ। এতেও পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির রীণাকে বয়স এবং পৃথিবী খানিকটা মেদ দিয়ে মদালস করেছে।

রীণা টবে পা রেখে ব্যালকনিতে প্রায় ঝুঁকে পড়েছে। রাত একটার কম নয়! সিন্ধু ছুটে গিয়ে প্রায় পড়ন্ত রীণাকে জড়িয়ে ধরল,

—কি করছিলে? সিন্ধু দেয়াল অব্দি রীণাকে নিয়ে গেল।

—দেখছিলুম, অনেক দূর থেকে, অনেক পরে, ঘোর কাটা রীণা বলেছিল, ঠিক তখনও বুঝতে পারছে না সে কিছু খারাপ কাজ করছিল কিনা, বা কেন এই পুরুষ মানুষ এত রাতে তাকে ব্যালকনিতে জড়িয়ে ধরে, কেন তারা দুজনে এখানে। রীণা তখনও বুঝে উঠতে পারে না, ও তখনও একটা স্বপ্নের মধ্যে সাঁতার কাটছে। সীমাহীন যেখানে সে এক স্বতন্ত্র কবি, একটা গভীর রাত্রের নির্মাণে ব্যস্ত।

—তুমি কি সুইসাইড করছিলে, গলায় রাগ—পাগল হয়েছ! সিন্ধু কাঁপতে থাকে—এত রাতেও কি আমায় বাঁচতে দেবে না?

—কিছু বুঝতে পারছি না সিন্ধু, রীণার চুলে চোখেমুখে বৃষ্টির ছাঁট।

এবারের চেষ্টায় কোনো প্রমাণ রাখেনি রীণা। আগের চিহ্ন রাখা চারটে আত্মহত্যার ফাঁকে-ফোকরে আরও দু-তিনটে মিনি চেষ্টা ছিলই। ওই সেদিন যদি পাঁচতলা থেকে রীণা পড়ে যেত! এবং সকালে উঠে দেখত রীণার রক্তাক্ত লাশ ঘিরে অসংখ্য মানুষ, কুকুর, শালিখ, বাদুড় ঠোকরানো চোখ! এবং সিন্ধুকে নিয়ে মুখে মুখে টিটকিরি হাসি মস্করা। শোকাপ্লুত মানুষও সে পেত। এমনকি বিবাহযোগ্যা কন্যার পিতা!

এ রকম প্রত্যেক আত্মহত্যার পরপরই থতমত। তার পর ঢলাঢলি বেড়ে যায়। বাইরে নিশি যাপন কমিয়ে ফেলত সিন্ধু। মদ খাওয়াও কম। রীণাকে নিয়ে বাইরে বেরতো নিয়মিত। এদিক সেদিক ঘুরতে যাওয়া। এমনকি সাহিত্য-সভার ডাক এলেও বলত, সঙ্গে আমার স্ত্রী যাবেন। এবং রীণা হালকা পাখির মতো কিচির মিচির ডালে ডালে উড়ে বেড়াত। এই ভাবে চলতে চলতে ফের খসে পড়ত নিয়ম। মদ খেয়ে ফুলে উঠত সিন্ধুর পেট, চোখের নিচে ফ্যাট, ঠোঁট পুরু। কোনো-কোনোদিন থেকে যেত বাইরে। এবং সেই বাইরে গুলোও হয়ে পড়ে নারী ঘটিত। যেমন হৃষিকেশের বাড়িতে থাকা মানেই একটু রাতে কেয়া হৃষিকেশকে ঘুম পাড়িয়ে একদা বিখ্যাত লেখক অধুনা মদ্যপ সিন্ধুর ঘরে স্বচ্ছ বেগুনি নাইটি পরে ঢুকবে। এবং যথারীতি শেষ রাতে ফিরে যাবে। এ সবই বিখ্যাতের অধিকার।

কেয়া যেমন বলে তুমি একা রীণার হতে পার না, আমারও। আমি কি তোমাকে দেখাশুনো করি না? আমি কি তোমার লেখার জন্য প্রেরণা হইনি? দেখ আরও পাবে। আরও সুন্দর হয়েছি। তোমার নতুন কবিতার বইটা সিন্ধু আমাকে একদিন খুন করবে। তোমাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করে না।

ঘরময় ফরাসি পারফিউমের ছন্দবদ্ধ। সমুদ্র পারের কোনো হাওয়া মহলের মায়া-শর্বরী।

—তুমি কি রীণাকে হিংসে কর কেয়া। সিন্ধু অতল থেকে বলল।

—ছিঃ ছিঃ ছিঃ! কেন করব! ও তো বেচারা, ওকে তোমার মতো পুরুষ নিয়ে জীবন কাটাতে হলো, বেচারি! ওকে হিংসে করব সিন্ধু? আমি আমার ভাগ্যকে হিংসে করি। তোমার মতো বড়ো কবিকে কাছে পাই, যত্ন করি। এ কি আমার কম সৌভাগ্য, কেয়া বাস্তবিক নারীর মর্যাদায় হেলে দাঁড়াল।

তুমিতো বেহুলা, উর্মিলাদের যত ডায়ালগ বলছ, সিন্ধু কেয়ার বুকে টোকা মেরে হাসল

—কেন কম কিসে। ও! তোমাকে ভালবাসি বলে? আমি তো রক্ত মাংসের তোমাকে ভালবাসি না, তোমার চেয়ে অনেক সুন্দর ঝকঝকে পুরুষ দেখেছি মশাই। তোমার কবিতাকে ভালবাসি। কি করে যে তুমি ঐ ভাবে অক্ষর সাজাও সিন্ধু! তুমি একটা সত্যি সত্যি নাবিক সিন্ধুবাদ। ওহ্ নাবিক আমাকে সমুদ্রে নিয়ে চল। দু একটা দিন তোমাকে পুরোপুরি কাছে পেতে চাই। তোমার আরও অনেক কবিতা, উপন্যাসের জন্য নিজেকে দায়ী করতে চাই। জানো তো আগের দিনে গ্লাডিয়েটরদের শহরের সেরা রমণী দেওয়া হত তাহলে গ্লাডিয়েটার আরও শক্তিশালী আর মারকুটে হতো, তোমার নির্মানে তন্ময় থাকার জন্য আমাকে দরকার সিন্ধু।

কেবল এই ঘরটিই বিদেশী নয়, কেয়াকে বিদেশী পরী মনে হয়। এখন এই পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে সিন্ধু মনে করতে পারে কত কবিতা, ছোটগল্প, জীবনবোধ, নিস্পৃহতা, রুচি, নর-নারীর সম্পর্ক কেয়ার কাছে শিখেছে।

এভাবেই একদিন মীনা ভার্গব বোম্বাই থেকে কাজের ছুতোয় সিন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসে। আসলে মীনা সিন্ধুর হিন্দী অনুবাদিকা, সিন্ধুর ওপরে একটা ডক্-মেণ্টারি করছে ও—'সিন্ধু এ্যাণ্ড হিজ টাইম'। খুব বুঝদার মেয়ে। দুটো বিয়ে, বছর দশেকেই ওলোট পালোট এখন সিন্ধুর গুণমুগ্ধ। চিঠি লিখেছিল, আমি তোমার ফ্যান নই কেবল, আমি তোমার পতাকাবাহী। ডার্লিং ইন্দাস।

এ ধরনের ঘটনা তো অনবরত ঘটতেই থাকে। রীণার নাকের ওপর দিয়ে মীনা ভার্গব সিন্ধুকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। রীণার সামনে অশ্লীল হাসি তামাশা করে। কখনও এক বাক্স বোম্বাই মিঠাই, বোম্বাই সিল্ক এক খণ্ড রীণা পেয়ে যায়। কখনও মাঝরাতে বা শেষ রাত্রে, কখনও পরদিন হোটেলের ক্লেদ ক্লান্তি নিয়ে ফেরে একদা ব্রজবাসী।

এ সবেও রীণা ভ্রুক্ষেপ করে না কারণ সে বিখ্যাত মানুষের স্ত্রী। এবং এমন বিখ্যাত যাকে সকলে চায়, শ্রদ্ধা করে, তাকে কুক্ষিগত করে রাখা অন্যায়, এই বোধ হতে রীণার একটু দেরি হয়েছিল এবং সেই ভাবেই ঈর্ষাহীন অধিকারহীন কণ্ঠে সে বলতে পারত। কারণ ততদিনে বাস্তবিকই দেশের সমস্ত কর্ণার থেকে সিন্ধুকে ভালবেসে ফেলেছিল। এমন কি কমুনিস্ট কংগ্রেসই

কেবল নয়, আর এস পি, এস ইউ সি, নকশাল, আর এস এস এবং আরও বিস্ময় কোনো কোনো মন্দিরে বা সাধু সন্ন্যাসী আখড়ায় সিন্ধুর ভজন, দেহতত্ত্ব শুরু হয়ে গিয়েছিল। ফলে কিছু দূরে থেকেও রীণা সিন্ধুর জন্য সমস্ত সাজিয়ে দিচ্ছিল।

এমনকি এই আত্মহত্যা-আত্মহত্যা একটা খেলা বেশ কিছু বছর ধরে খেলে চলেছে সেটাও সিন্ধুর বড় হওয়ার পেছনে একটা ব্যাপার, বিশ্বাস করে ফেলেছিল। এবং একদিন সন্ধ্যায় ব্যালকনির বাগানে গাছের গোড়া খুঁড়ে সার দিয়ে, সে চিঠি লিখতে বসল। এবং শেষ নোট 'আর ভাল লাগছে না, বিদায় স্বামী। আমার তৈরি গাছগুলো কাউকে দিয়ে দিও, বিল্লিকে দেখো'। বিল্লি মেয়ে, শান্তিনিকেতনে পড়ে।

খুব ধীরে। পেশাদার আত্মহত্যাকারীদের মতো ভাঁড়ার ঘর থেকে টিক টুয়েন্টির নতুন শিশি নিল, এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চোখ মুখ দেখতে দেখতেই নির্জলা গলায় ঢালল, তখন পাখিরা শহরের ম্লান আকাশ ডিঙিয়ে শীতের জঠরে ঢুকে পড়েছে।

মৃত্যু হল না, অথচ মৃত্যু ঘিরে রইল। অচেতন চেতনের আগে কটা দিন। রীণা কিভাবে যেন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। ও কিন্তু কখনই এই ভেবে ঝাঁপ দেয়নি যে বেঁচে যাবে, কারণ অবধারিত রুটিনের মতো একটি মৃত্যু উতরে গেলে পরবর্তীর জন্য তৈরি হতো।

কবে যেন খাটে চেয়ারে বাসা বেঁধেছিল গোটা কয়েক ছারপোকা। ফের নিজে থেকেই কোথায় উধাও হয়ে গেল সেই কাজেই টিক আনা হয়েছিল। পড়েই ছিল, রীণার কাজে লেগে গেল।

বেশ কটা দিন শরীর ঠিক রইল না। নানা উৎপাত হতো। ফের একদিন সাজগোজ করে সিন্ধুর সঙ্গে মশাগ্রাম, ইন্দ্রপ্রস্থ, ইছাপুর, দিল্লি—নানা কবিতা সভায় ঘুরে বেড়াল। শাড়ি কিনল, ছবি কিনল, পোষা ময়নার জন্য যবের ছাতু। বনসাই করা আমলকি গাছ থেকে ক্ষুদে ফল ছিঁড়ে সিন্ধুর লেখার টেবিলে সাজিয়ে দিল।

বোঝাই গেল না রীণা একটা মৃত্যু-মৃত্যু খেলার পয়লা নম্বর খেলোয়াড়, বরং উল্টোটাই, সিন্ধুর জন্য নতুন জামা প্যান্ট, রঙিন সোয়েটার, বিদেশ ফেরত বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে এল পোর্ট ওয়াইন, সিন্ধু ভালবাসবে, সিন্ধু কুমড়ো ডাঁটার ডাল ভালবাসে তাও হলো, এমনকি মোচাও!

সিন্ধু কখনও ভোর রাতে কখনও পরদিন বেলা দশটায় বাড়ি ফিরে পচা আপেলের মিষ্টি গন্ধে কলম নিয়ে বসল, সিন্ধু ছাড়া আর কেউ তেমন সাড়া পেল না রীণার মৃত্যু-বেদনা। আত্মহত্যার ঘটনাগুলি চুপি সারেই ঘটে যাচ্ছিল।

এরই মধ্যে রীণা কোনো কোনোদিন গাছে জল দিতে দিতে কিম্বা কমলা লেবু ছাড়াতে ছাড়াতে কত রকম সাতপাঁচ ভেবেছে। যদি কোনোদিন ভোররাতে রেল-লাইন ধরে হাঁটে কিম্বা ব্লেডে হাতের শিরা কেটে ফেলে, মন্দ হয় না। কত নতুন নতুন মৃত্যু মাথায় ভর করে। কখনও বেনারসী গলায় পেঁচিয়ে, কখনও ইলেকট্রিক শকে, ভেবে বিভোর হয়ে যায়। সিন্ধু যেমন তার কবিতা নিয়ে ভাবে নতুন নতুন অঙ্গসজ্জায়, বিশেষ্য, বিশেষণ, যমক, উৎপ্রেক্ষায় কবিতা সাজায়। একেকটা শব্দ নিয়ে রাত কাবার করে, তেমনি রীণা ভেবে চলে মৃত্যু দিয়ে অভিনব, উদ্ভট সেসব ভাবনা। যেমন পাথর চাপা দিয়ে কিম্বা পাগলা হাতির পায়ের নিচে কিম্বা সেই বিশাল এরেনা, ক্ষুধার্ত সিংহ গর্জন করে এগিয়ে আসছে। অসহায় রীণা একা সন্ধেবেলায় ঘরে বিশাল শূন্যতায় সিন্ধুর সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ খুলে বসে।

—আমার যে উপন্যাসটা ফ্রেঞ্চ-এ অনুবাদ হচ্ছে পড়েছ? একদিন দুপুরে মাছ থেকে কাঁটা ছাড়াতে ছাড়াতে জিজ্ঞেস করল। ঐ সিন্ধুর এক নেশা অন্তত তিন রকম কুচো মাছ, বেশ কাঁটাওয়ালা। যেমন চাপলে, খয়রা, ফলুই, পুঁটি, চারাপোনা যে-সব সহজে কেউ খেতে চায় না সেসব ওর প্রিয়। শেষে একটি কাতলার দাগা অথবা চিংড়ি। ঐ কুচোগুলি রীণার একদম পছন্দ নয়, তবু মেনে নিয়েছে। ওর মুড়োও ভাললাগে না। মনে হয় যেন একটা নরমুণ্ডই সে খাচ্ছে। অথচ প্রত্যহ ভাত পাতে সিন্ধুর একটা মুড়ো অবশ্যই চাই। এমনকি মদের সঙ্গেও পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ো ভাজা খুব প্রিয়।

—না, কোন উপন্যাস? জানি না তো! রীণা কাঁচা লঙ্কায় দাঁত বসায়।

—ঐ 'আড়কাঠি'। কেন তুমি পড়নি? পড়ে দেখতে পারতেও খারাপ নয়।

—আমি তোমার কবিতা পড়তেই ভালবাসি সিন্ধু।

—কিন্তু 'আড়কাঠি' কবিতা থেকে খুব বেশি দূরে নেই। একটা নতুন ভাষা এবং রহস্যে লেখা।

—হবে হয়তো, পড়ব।

—জানি, ও আর তুমি পড়বে! হোঃ হোঃ হোঃ, সিন্ধু মাছের মুড়োর ঘিলু হুশ্ টেনে নেয়।

—ও তুমি যতই হাসো আমার কিন্তু মনে হয় তোমাদের উপন্যাসে একটা ফাঁক থেকেই যাচ্ছে।

—একটু মন দিয়ে পড়ে দেখ ফাঁকটা ভরে যাবে। পাবদাটা দারুণ না? আচ্ছা আজকাল কালবোশ পাওয়া যায় না? ওহ্ চেতল খেয়েছিলুম কুচবিহারে, নাঃ মাছ খাওয়ার সে জুৎ নেই।

দুপুরের দিকে সিন্ধু বেরিয়ে গেলে রীণা 'আড়কাঠি' নিয়ে পড়তে চেষ্টা করল, দু চার লাইন পড়ে এগোতে পারল না। বরং র‍্যাকে চোখ পড়তেই চমকে উঠল, মাত্র পঞ্চাশে সিন্ধু প্রায় পাঁচশ আটখানা উপন্যাসের জনক।

কোথায় বেড়াতে যায়নি রীণা। সুন্দরবনের ভেতরের লুঠেরাদের দুর্গ, কিম্বা কানহা ফরেস্টের শাদা বাঘের গুহা। এমনকি মনে পড়ে যায় সুন্দরীতমা নারী রীণাকে ভালবাসতে বাসতেই তো এক দুপুরে সিন্ধু পৌঁছে গেছিল ফালুট। কি সুন্দর সেসব দিন। চারধারে বরফ আর লাল রডড্রেনডনের জেল্লা, জীন্স্ আর হলুদ কার্ডিগানে দীর্ঘাঙ্গী রীণা, সৌন্দর্যের রাণী, সারাক্ষণ হাওয়া আর পরাজাগতিক সুগন্ধী ফালুটের রানী রীণা, ফায়ার প্লেসের ধারে উঁচু পৃথিবীর ছিন্নভিন্ন রাত, ভোলা যায় না, আর সিন্ধু, রীণাকে নিয়ে লেখা কবিতাগুলি মালা করে পরিয়ে দিয়েছিল এক শীতার্ত দুপুরে। তবু একদিন রূপবহ্নি রীণা সমস্ত পোশাক আশাক সরিয়ে তাল খুঁজছিল হিমালয়ের বরফ শৃঙ্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। সারাক্ষণ হাসল, কথা কইল, মদ্যপানে সিন্ধুকে সঙ্গ দিল, গান গাইল, ফায়ার প্লেসের ধারে একটু মায়া রমণীর মতো নাচল। শেষে সিন্ধু যখন ঘুমিয়ে পড়ল, মৃত্যু কাঁধে হাত রাখল, এসো আর দেরি কোরো না রানী। রডড্রেনডনের ঝালর গা থেকে সরিয়ে এগিয়ে গেল।

সারা ঘরে রীণার কত যে ব্লো-আপ, গোটা দশেক অ্যালবাম, রীণার রূপে উপচে পড়ছে। কাব্যগ্রন্থগুলি রীণার জন্য লেখা কবিতায়। ব্যাঙ্কগুলি রীণার জন্য টাকায়। সময়ে অসময়ে থাকার জন্য তিনটি নানা ধরনের বাসস্থান। গণেশ ড্রাইভার মেমসাহেবের জন্য সর্বদা অপেক্ষা করে থাকে। অন্য পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার অধিকার। রীণা কোন এক সন্ধ্যায় নিজের ব্লো-আপ পোট্রেটে ফুল থালা, ধূপ, অগুরু দিয়ে সাজিয়ে দেখেছিল কি অপূর্ব! মৃত্যুর পরও সে সুন্দর থেকে যাবে। কি মানাচ্ছে!

একি! রাতে নেশা উজ্জীবিত সিন্ধু চমকে উঠেছিল, একি করেছ? এবং সে ভয়ও পেয়েছিল। রীণা মরে যায়নি তো?

—দেখ কি সুন্দর লাগছে! আমি মরে গেলেও সুন্দর থাকব। কেন তোমার ভালো লাগছে না?

মোমের আলো বাঁধানো কাচে পড়ে আরও ভৌতিক। পাশে দাঁড়ানো সত্যিকারের রীণার অগোছালো রিক্ত সাজ পোশাকের কাছে ছবি। দিব্য রীণা সেদিন জিতে যায়। শুধু কি তাই, যেন বাড়ির বাঁধা ঝি বারুকে মনে করিয়ে দিচ্ছে আজ প্রয়াত পত্নীর জন্মদিন।

—এইখানে তোমার জিত রীণা! তুমি আমার চেয়ে বড়ো কবি। সত্যি আজ তোমাকে অচেনা লাগছে। ঐ ছবির মেয়েটি একদা আমার স্ত্রী ছিল। রীণার দিকে তাকাতেই সিন্ধু ভয়ই পাচ্ছিল। যদি সত্যি দুপুরের দিকে রীণা মরে গিয়ে থাকে এবং এখন অপদেবতা মানুষের চেহারায় ফিরে এসেছে, ধূপ, অগুরু ফুলের গন্ধ মাত করে একটা বোঁটকা ভূতো গন্ধও সে পেল, মরা মানুষের গায়ে যেমন। এবং ছিঃ ছিঃ একি করেছ বলতে বলতে রীণাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে টের পেল, বাস্তবিকই রীণা মৃত। কারণ সে একটা কাঠ বা পাথরের টুকরোকেই আলিঙ্গন করল যার রক্ত শীতল, উত্তাপহীন, মৃত দেহের বিবসতা সিন্ধুর মদ্যপ শরীর শক্ খাওয়া এবং সে চাপা ভয়ার্ত গলায় লম্বা আড়ষ্ট আওয়াজে ফের একবার বলতে চাইল রী-ণা-তু-মি-ঠি-ক আছো তো? তখনই সাহেব পাড়ায় 'সিলেক্টেড পোয়েমস অব সিন্ধু' বাহান্ন হাজার বিক্রি হওয়ার জন্য উৎসবের আয়োজন চলছে। একসঙ্গে আমেরিকা, ইংলণ্ড এবং কানাডায় কবি সম্মেলন ও মিট দ্য প্রেস-এর ব্যবস্থা চলছে।

অনেকদিন পর আজ সিন্ধু তৃতীয় ড্রয়ার খুলে কালো ফণা তোলা পিস্তলটা বাইরে বের করেছে। অনিমেষ দিয়ে যাবার পর একবার মাত্র বুলেট ভেতরে ভরে দেখেছে। কখনও চালিয়ে দেখেনি, নিরুত্তাপ হেঁটে সেই গুঁড়িটার সামনে দাঁড়ায় যেখানে অনিমেষের বুলেট প্রথম বিদ্ধ হয়েছিল। এক টুকরো তীক্ষ্ণ অন্ধকার ঢুকে।

সিন্ধু বুলেট ভর্তি পিস্তলের নল রগে চেপে ধরে। এর আগে কখনও ব্যবহার করার কথা ভেবে ভয় পেয়েছে, পাশের ঘরে রীণা সামান্য সুতো ছিন্ন করার শেষ দৌড়ে পৌঁছে গেছে, এবার তার উপজীব্য ছিল ঘুমের বড়ি। সে এবারও কতরকম মৃত্যুর কথাই ভাবত, যেমন ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া, পোড়ো বাড়ির ভূতের হাতে কিল, ক্ষুধার্ত সোলজারের হাতে ধর্ষিতা হয়ে কিম্বা সুন্দরবনে বিধবা পল্লীতে

বাঘের ঠিকানা চাইবে। কখনও হার্ট ফেল করার কথা ভাবেনি, কোনো আকস্মিকতা সে বিশ্বাস করত না। সে কবি, সিন্ধুর রীণা।

আজ বহুদিনের চেষ্টা রীণার পক্ষে হয়তো সত্যি হবে। যেমন সিন্ধু খ্যাতির মিনারে উঠে পরের পর দুটি বুলেট শেষ পর্যন্ত রগে চালিয়ে দিতে পারবে। অথবা এক বা দুই বেরিয়ে যাওয়ার পর তিন চার পাঁচ ছয় নম্বর অবিকৃত মিউজিয়ামে চলে যায়, যেখানে লোকে সিন্ধু সেনের মৃত্যুদৃশ্য ভাবতে ভাবতে আতঙ্কে যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠবে। ঐ তো জগৎ বিখ্যাত সাহিত্যিক সিন্ধু সেনের পিস্তল !

দুর্গা দত্তর কবিতা

মল্লিনাথ গুপ্ত

কম বেশী বছর দশ আগে বিভাবেই দুর্গা দত্তর কিছু কবিতা পড়েছিলাম। পড়ে প্রথমে অবাক, পরে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। দীর্ঘদিন পরে বিভাবের পাতায় আবার তিনি ফিরে এলেন ! বর্তমান সংখ্যার এই কবিতাগুলিকে কি বলব ? ঠিক এই মুহূর্তে গভীরসঞ্চারী এই কবিতাগুচ্ছকে বর্ণনা করার সঠিক ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। পাঠকের বিচারের ওপরই ছেড়ে দিলাম। একমাত্র বিভাব ছাড়া পরেও অন্য কোনখানে আর এই কবির কবিতা দেখেছি বলে মনে হয় না। একজন পরিণত কবির সমস্ত চরিত্র লক্ষণই এই কবির কবিতায় বিদ্যমান। লিখলে বর্তমান দশকের একজন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য কবি হতে পারতেন, তাতে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। আত্মপ্রকাশে সুতীব্র অনাসক্তি লাজুক এই পালিয়ে বেড়ানো কবিকে লোকলোচনে আনেনি। এই কবিতাগুলি বছর দশেক আগে লেখা। সম্ভবত এরমধ্যে তিনি আর কবিতা লিখেননি। আর লিখবেন কিনা তাও আমাদের জানা নেই। দক্ষিণভারত প্রবাসী কবির এই কবিতাগুলি কবিপত্নী শ্রীমতী শর্মিলা দত্ত উদ্ধার করে বিভাব সম্পাদককে দিয়েছেন। তার কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম।

কবি

কিছুই পারে না কবি শুধুমাত্র ক্ষয়ে যাওয়া ছাড়া।
অর্থের সঞ্চয় কিম্বা গ্রামে গঞ্জে সদরে শহরে
বক্তৃতামঞ্চের থেকে কোনো পলকা সম্মান কুড়াতে
কবি তো পারে না ;

শুধু গাছের ভিতরে শুয়ে দ্রুত লয়ে বয়ে যায় জল ও সময়।
গাছও তো একদিন দুরন্ত খবরের মতো বজ্রের সমস্ত তেজ
শুষে নেয় শিকড়ে বাকড়ে, মরা মাঠে, মাটির চৌচিরে—
শুদ্ধ কোনো চরুর সন্ধানে কবিও তো জলে ওঠে হোমাগ্নিশিখায়
ধ্বংসস্তূপের দিকে একা একা হেঁটে যায় শ্যামলবিন্যাসে
রোপণকালীন গান গেয়ে চলে গ্রামে গ্রামান্তরে, কারণ
কিছুই বোঝে না কবি, শুধুমাত্র এইটুকু জানে :

সমুদ্র বিরুদ্ধে তবু জেগে থাকে তুলিয়ার শীর্ণ ঘন হাত।

থাকা

তলায় তলায় ধরে ঘুণ।
করোটির গর্তে মদ শেষ করে উঠেছে তান্ত্রিক
সব দরোজা বন্ধ করে পশ্বাচারের কাছে চলে যায়
পৌত্তলিকতার ফাঁদে রক্তমাংসে লাগে খুব টান—
পতনমুখীন এই নির্ভরতা থেকে
অন্য কোনো চলমানতায় যাবার সমস্ত পথ
সে নিজেই বন্ধ করে দিয়েছে কৌশলে।

তান্ত্রিকের মতোই, অন্য সব মানুষও পারে না।
রুদ্ধ-ঘাত ভেঙে দিয়ে উজ্জ্বল প্রবাহে
শীর্ণ স্রোত চলে যায় পূর্ণিমার দিকে,
জলস্রোতধারা পারে—
মানুষ পারে না ; শুধু

গ্রীষ্মে ও বর্ষায় পেতে দেয় পিঠ
উবু হয়ে কোলে টানে গুড়

স্থাণু ও অনড় যেন ভীষণ পাথর, আর
পাথরে শেকড়ে শেকড়ে লাগে ঘুণ।

ধ্বস

ছিল, একদিন। আজ নেই, পালকের স্তূপগুলি ঢেকে দিয়ে গেছে রাত।
নদীর ছায়ার মতো কখনো অলীক হয়ে উঠে এসে ভেঙে গিয়েছিল
আমাদের প্রণামের ধারা, আকাশে তখনও ছিল মেঘ, যেন
প্রয়োজন হোক বা না হোক যখন তখন এসে ধুয়ে দিতে পারে সব হাত।
বিপুল আকুতিময় হেঁটে যাওয়া ছিল সেই দিন, অন্ধকারে বাতাসে ও ত্রাসে
আজ শুধু দেখা যায় ছিন্ন পালকের পাশে রক্ত মাখা ক্ষতস্থানগুলি
আঠারো দিনের শেষে যেভাবে পিছন ফিরে দেখে নেয় জন্মান্ধ জনক।

বাইশে শ্রাবণের চিঠি

এমন মৃত্যুর দিনে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় ঘরে।

দেওয়ালে পাথর ঘষে ক্রমাগত বেড়ে চলে ক্ষয়
বিচিত্র বর্ণের মূর্তি ডেকে নিয়ে যায় দুরান্বয়ে
কিছুতে বুঝি না কেন মানুষের প্রবণতা
খানাখন্দে পা ফেলে চলা,
দিগন্ত উধাও ? নাকি পথের সহজে রেখা নেই ?
অতল পোশাক ঢাকে পরিচিতি, মুখের আদল,
আর সমান ভারি হয়ে ওঠে
আমাদের ন্যূনতম নুনহীন খাদ্য-আন্দোলন ও বৃষ্টির আকাশ
এমন ধ্বংসের দিনে কাকে বলে যাবো আজ সব সত্যি কথা !

রঞ্জন

রঞ্জন শুয়ে আছে মাটির ওপরে।

ফসল কাটার গান থেমে গেছে উপান্ত সন্ধ্যায়,
ধান বা কাঁকর নিয়ে বাড়ি ফিরে মহোৎসবে মাতে
যে সব পুরুষ নারী
তাদের মজ্জায় আজ কনকনে শীতের কাঁপন।

কোনো গান নেই, শুধু মাদলের ব্যস্ত আয়োজন
রাতের আঁধার ভাঙে, শীতের শিশিরে মরা চাঁদ
অবোধ্য প্রাকারের মতো ঘিরে আছে মাঠ ঘাট জল,
মাটির ওপরে নিচে শতাব্দীর গাঢ় অন্ধকার
জমাট রক্তের মতো,
—পাথর বিছানো আছে পথে।

তবু সাধ ও স্মৃতির মতো কাস্তে কোদাল নিয়ে আগামী প্রত্যূষে
রঞ্জন মিশে যাবে খেতের গভীরে।

দূরের একজন

অঞ্জনার তীর দিয়ে যেন কেউ হেঁটে যায়
একা একা
আঁচলে আড়াল করে বাটি ;
সোয়াস্তি পুন্নার নয়, সিদ্ধার্থ বা সুজাতারও নয়, শুধু
নালকের মনে হয়েছিল যেন
সজলদিনের আভা মেখে নিয়ে কাছাকাছি শুয়ে আছে মেঘ
জেগে আছে স্মৃতি ও আরতি পাশাপাশি।

ভালোবাসার কবিতা

জানি, সব জানি
কেন আকাশের পাশাপাশি উড়ে চলে গিয়েছিল কাক
সকাল ছিল না, কোনো কথাকলি অভিজ্ঞানও ছিল না তখন
ধীর হয়ে নেমেছিল ছায়া যেন অস্তাচলে চলে যায় কেউ, আর
ছন্ন হয়ে ভেঙেছে বকুল, হাত; শান্ত খুব আজ ;
ধ্বংসস্তূপের পাশে বসে আছে অবশ তরুণী অবিকল।

জানি, খোলা ছিল সমস্ত জানালা, দূরে মাঠ, কুয়াশা শিশির
পথ জুড়ে ভাসানের গান, রাত্রিময় মঙ্গলপালায় , তবু
উত্তীয় ফেরে না : উল্লাসে উড়ছে আঁচল, আর
খসে গেছে সমুদ্রে যাবার চাবিকাঠি

জানি, সব জানি, আজ
শুধু বুক ছুঁয়ে বলো
শুরুতে আশ্বিন ছিল কিনা ?

তবুও

সন্ধ্যায় পুড়েছে ধূপ মধ্যরাতে কাকে জেলে যাবো।

উঠোন ডিঙিয়ে জ্যোৎস্না উঠে আসে ঘরের ভেতর
চরাচরে রক্তমাংসহীন কঙ্কাল ও প্রেতের ছায়া
খোলামাঠে তান্ত্রিক আচার—
প্রান্তরে পায়ের চিহ্ন, চলে গেছে বৈরাগীর দল।

অন্য ব্যভিচারে আমি সরে যেতে গিয়ে
দেখেছি জোৎস্নার কাছে অমল দু'হাত পেতে বসে আছে স্তব্ধ মধ্যযাম :

তাহলে কি সব পুড়ে গেছে, আর বাকি নেই কিছু !
পাশাপাশি বাড়িগুলি খরা ও বন্যায় গেছে কবে
এই ভেবে 'ভালো আমি বাসি না বাসি না' ভাবতেই
পাশের গাছের থেকে কেঁপে কেঁপে ঝরে গেল

শিশিরের ফোঁটা

অনুষঙ্গে শরীর : স্নান

খোলো, যেদিকে ইচ্ছে হয় খোলো,
অমল বৃষ্টির ধারা ধুয়ে দিক ঘর ও শরীর।
ভেঙে যায় জলবিম্ব,
ফেনাগুলি স্থির হয়ে থেকে ছুঁতে চায় শরীরের মায়া,
কেন কেউ জলের ভিতরে শুয়ে গড়ে নিতে চেয়েছিল জলের শরীর।
ফেনার আদলে ছিল ইচ্ছেগুলি মিলেমিশে গাঢ়তর হয়ে
তলায় তলায় ছিল টান, মেঘ ঝুঁকে পড়েছিল কিনারে জলের

ডাঙার ওপারে শুধু দেখা যায় একাকার হয়ে আছে
শহর সমাধি গ্রাম
অরণ্য প্রান্তর।
যখন যেদিকে ইচ্ছে খোলো, আর
ক্রমশ পশ্চিমদিকে চলে যেতে যেতে শুধু মনে রেখো
তোমার বৃষ্টির রেণু আবরণ করে এক সকালবেলায়
কেউ উঠে এসেছিল
বসেছিল
সমুদ্রের খুব কাছাকাছি।

তন্ত্র

এবার দক্ষিণ-জুড়ে মেঘ উঠলে টানটান শুয়ে থাকবো উত্তর শিয়রে
কোথাও যাবো না
দিনের অনন্তপদ্ম চুরমার হয়তো হোক হাওয়ায় হাওয়ায়
খোলসে খোলসে ভরা ভুলগুলি টুকরো হয়ে ভেঙে চুরে যাক
শুয়ে থাকবো উত্তর শিয়রে আজ কোথাও যাবো না

যজ্ঞে মন্ত্রে আগুনে ও ঘৃতে যূথ যোগাযোগে
প্রবল হোমের বীজ এই, সমস্ত দিবস
এখানে ওখানে মাটি ফেটে উঠছে, শেকড়ও খুঁজে ফিরছে বাসা
গ্রামীণ নিশ্বাসগুলি জাপটে ধরে বিকেলের আলো
অন্ধকার সব আরও অন্ধ হয়ে নুমুণ্ডে নুমুণ্ডে শুয়ে থাকে
ভেতরে ভেতরে শুকনো শ্বাস টেনে হাঁটু মুড়ে ডুবে যায় চাঁদ

দক্ষিণেও নেই আর উত্তরেও নেই কোনো মেঘ
উত্তর শিয়রে শুধু মাথা
চুরমার অনন্ত পদ্ম
ছড়ানো ছিটোনো হাড়ে সহস্র জলের গন্ধ পচা
সমস্ত দিবস জুড়ে হোমের আগুনে পুড়ে
কতমন্ত্রে সিদ্ধ হতে পারে এই উত্তরের শির

একটি ঘাসের দেশ
অনন্ত বিকেল নিয়ে একটি ঘাসের দেশ
তারপরেও কি জেগে উঠবে
উত্তর শিয়রে !

কথক বৃত্তান্ত

যে আগুন নিভে গেলে মানুষ বাঁচে না তার দীর্ঘ
কথাকলি শেষ করে কথকটি ঘুমোতে গিয়েছে।
ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ি, নষ্ট ভ্রূণের জ্বালা চেপে ধরে
যুবতীটি একা বসে আছে ; নিচু স্বরে অস্পষ্ট চড়ুই
পাখি বাস্তুর সন্ধানে—টুকরো ডালপালা খড়কুটো
আনাচ-কানাচ এসবই যথেষ্ট তবু ওড়ে এদিকে ওদিকে।
কথক ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিদ্র ঘরের অবসরে। পাখিটির
ভয় খুব কথার ভাষানে।
কে কাকে আশ্রয় দেবে ! যুবতীর
দ্বিধা আর চিন্তাগুলি তীব্রতর হয়, পাখিটিও স্পষ্ট হতে
থাকে। হাত পা বেরিয়ে আসার জন্যে ব্যাকুল উদ্‌গ্রীব
ডানা ও পালক নেই, ওড়াওড়ি নেই, রক্তের পিণ্ডগুলি
খামচে ধরে রাতের আকাশ। চাঁদ বা নক্ষত্রবিহীন রাত্রির
রহস্যে দূরের শ্মশানবন্ধু—কেবল শ্মশানবন্ধু
শববাহকের দল জেগে থাকে, যুবতীও জেগে আছে।
কথক ঘুমিয়ে থাকে মৃত পুরাণের টুকরো মুখে।
ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ি
পাখিটির কেউ নয়, অনাত্মীয় পাথর কেবল। যুবতীর
নষ্ট ভ্রূণজ্বালা চেপে ধরবার এক ছল, তাছাড়া কিছুই
নয়। সিঁড়িটি তবুও থাকে। পাখিটির ওড়াওড়ি
বাস্তুর সন্ধান ছাখে, যুবতীর ময় হওয়া ছাখে,
শ্মশানবন্ধুর কথা শোনে, আর ছাখে : কথক
অনন্ত ঘুমে ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছে আরতিবিহীন একমুখে।

‘টানাপোড়েন’—উপন্যাসের চিত্রকল্প অথবা চিত্রকল্পের টানাপোড়েন

রবিন পাল

চিত্রকল্পের নিছক সংকলন কোনো তাৎপর্য প্রসারণের দিকে আমাদের নিয়ে যায় না। লেখকের উপন্যাসাবলির থীমের উপস্থাপনা বা চিত্রকল্প ব্যবহারের ধরন, বিশেষ উপন্যাসটির থীম, তার উদ্ঘাটন বা উপস্থাপনার লক্ষ্য এবং পরিকল্পনা সঙ্কেয় হলেই চিত্রকল্পের সংকলন, তার বিভাজন, বিন্যাস সংক্রান্ত সক্রিয়তা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেয়। এ ভাবেই থীম ও চিত্রকল্প হয়ে ওঠে একে অন্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনের পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং একটি উপন্যাস যেমন পূর্বাপর রহিত দেশ-কাল-লেখক মানসের ভাঙাগড়ার দ্বান্দ্বিকতায় উদাসীন কোনো শিল্পকর্ম নয়, তেমনি চিত্রকল্প বিশেষের যতই মৌলিকত্ব বা গভীরত্ব থাক, সমগ্র উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্যতার প্রেক্ষিতেই তার শিল্পগুণের পরিমাণ নির্ভর করে। থীম বলতে আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি তা এক আইডিয়া—এ কারণেই এক বিমূর্তন—যা কোনো উপন্যাসে উদিত হয়, আসে এক মূর্ত উচ্চারণে—Eugene Falk যেমন বলেছেন তাঁর Types of Thematic structure বইতে। এ ভাবেই চিত্রকল্পের এক অনুক্রমণী সহজেই হয়ে ওঠে থীমের অনুক্রমণী। এর ব্যতিক্রম যে ঘটে না তা নয় কিন্তু প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় চিত্রকল্পাবলি হয়ে ওঠে থীমেরই পথ-প্রদর্শক। সমরেশ বসুর একটি উপন্যাস বেছে নিয়ে তার অন্দরমহলে আমরা এই দিগ্‌দর্শনী[১] নিয়েই যাতায়াত করতে ইচ্ছা করি।

॥ ২ ॥

শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "বঙ্গীয় শব্দকোষ"-এ 'টানাপড়েন' কথাটির অর্থ এ ভাবে নির্দেশ করেছেন—"কাপড়ের দৈর্ঘ্যের ও বিস্তারের সূতা (Warp ; Woof)। টানা পড়েন করা (গৌণার্থে) বারংবার আনাগোনা করা।" তিনি শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "পারিবারিক প্রবন্ধ" থেকে এর একটি প্রয়োগ দেখিয়েছেন। তা হল—"ত্বদীয়তা এবং মদীয়তা ভাব কাপড়ের টানা পড়েনের ন্যায় এমনি পরস্পর অনুস্যূত যে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া লওয়া নিতান্ত অসাধ্য।"[২]

সমরেশ বসুর উপন্যাসটির পাঠক মাত্রেই জানেন উপন্যাসটি তাঁত শিল্প কেন্দ্রিক, শীর্ষনাম সেদিকেই প্রথমত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১লা বৈশাখ ১৩৯৪-এ পুস্তকাকারে প্রকাশিত (ইতিপূর্বে শারদীয়া দেশ-এ প্রকাশিত) এই উপন্যাসটির ভূমিকায় লেখক তো স্পষ্টতঃই আমাদের জানান—"আমি চেষ্টা করেছি, বিষ্ণুপুরের তাঁত শিল্পীদের জীবন যাপনের ছবি, মুখের ভাষা, ধ্যান-ধারণাকে রূপ দিতে।" লেখক বলেন "এক প্রায় গতায়ুঃ শিল্পী-গোষ্ঠীর পরিচয়" তুলে দিতে চান বাঙালির হাতে। উপন্যাসটি উৎসর্গও করা হয়েছে অতুলনীয় শিল্প সৃষ্টি করে ও "যাদের ঘরে অন্নের হাহাকার, মাথা গোঁজবার মতো একটি অটুট ঘরের অভাব, সেই বিস্ময়কর স্রষ্টা শিল্পীদের উদ্দেশে—।" এ ভাবেই উপন্যাসটির থীম, লেখকের অভিপ্রায় প্রভৃতি সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট আভাস উপন্যাসটি পড়বার আগেই পাঠকরা পেয়ে যান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জীবিকাশ্রয়ী উপন্যাস লেখার দিকে তাঁর যে একটি বহমান আগ্রহ ছিল তারই বিশিষ্ট উদাহরণ অপরাহ্নবেলার এ উপন্যাসটি।

উপন্যাসটি সুস্থির ভাবে পড়তে গিয়ে যে কোনো পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন যে এর প্লটের কয়েকটি বৃত্ত আছে। ১ম বৃত্তে কাহিনীর বিস্তার তাঁত শিল্পী পাঁচুর পারিবারিক জীবন, তার স্ত্রী ছেলেমেয়ে, বুড়ো বাবা, পারিবারিক অবস্থা এবং পাঁচুর মেয়ের কৈশোর বা বাছুরে প্রেম পাঁচুর জনৈক সহকারীর সঙ্গে। ২য় বৃত্তে আছে পাঁচু ও টুকির অবৈধ প্রেমের কাহিনী। ৩য় বৃত্তে কাহিনী ঘোরে পাঁচুর শিল্প মনস্কতায়, নকশা তৈরির স্বপ্নে (যা অনেক তাঁতীরই থাকে), সার্থক গুরু অভয় খানের কাছে কঠিন স্বীকৃতি লাভ, রেশমশিল্পী সঙ্ঘের নকশাগ্রহণ, দেশ বিদেশে প্রচার। এর সঙ্গে আসে তাঁত শিল্পে গরিব তাঁতীদের বঞ্চনা, দারিদ্র্য, জীবনের অনগ্রসরতা, যুগের পরিবর্তনে বালুচরী শাড়ী তৈরির সূক্ষ্ম জটিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল শিল্পকর্মের সমাদর লুপ্তি, সস্তা নকশার দিকে ঝোঁক আর পাঁচুর মতো

যথার্থ শিল্পীদের বেদনা। স্বভাবতই কৌতূহল জাগবে এই ত্রিবৃত্তের কোন কোন অংশ উপন্যাসটিতে গুরুত্ব পেয়েছে, নাকি তিনটি বৃত্তেরই ভারসাম্য আছে। সতর্ক পাঠকের বুঝতে ভুল হবে না যে 'টানাপোড়েন' উপন্যাসে ১ম ও ২য় বৃত্ত যতটা গুরুত্ব পেয়েছে, ৩য় বৃত্ত তা পায়নি। উপন্যাসটির প্রথমার্ধে ১ম ও ৩য় বৃত্তের এবং অপরার্ধে ২য় বৃত্তের প্রাধান্যও নজরে না পড়ার মতো নয়। যাঁরা সমরেশ বসুর পূর্বাপর লেখার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন, সমরেশ বসুর শিল্পকর্মে এই টানা পোড়েন গোড়া থেকেই আছে। ব্যষ্টি ও সমষ্টির জীবনের যে মহৎ ঔপন্যাসিকের রচনায় অন্বিষ্ট ও লভ্য, তার স্পর্শ যে সমরেশের লেখায় কখনো আসেনি তা নয়। কিন্তু সমাজপটের সামগ্রিকতা রচনা এবং ব্যক্তির সামাজিক সত্তার সক্রিয়তা ও ব্যক্তির নিজস্ব রক্তমাংসল দিন যাপনের কাহিনীর কোন দিকে তিনি গুরুত্ব দেবেন এ ব্যাপারে মনস্থির করতে পারেন না। উত্তরঙ্গ (১৯৪৯) এবং জগদ্দল (১৯৬৬) গঙ্গা (১৯৫৭), টানাপোড়েন (১৯৮০), বাথান (১৯৮৫) এর ব্যতিক্রমী প্রয়াস এই প্রবণতাকেই প্রতিষ্ঠিত করে। তা যদি না হতো তাহলে 'টানাপোড়েন'-এ আমরা পেতাম তাঁত-শিল্প সংক্রান্ত মানুষের বহুস্বর এবং দেশ-কাল-সমাজ বিশেষের সঙ্গে গোষ্ঠী জীবনের দ্বান্দ্বিকতা। কিন্তু তা উপেক্ষিত, বরং অন্যান্য স্থানের মতো এখানেও সংযমরাহিত্যে তিনি ঢুকে পড়েন প্রেমের শরীরীয়ানার অন্ধ গলিতে। এ ব্যাপারে তাঁর পটুত্ব নিশ্চয়ই স্বীকার্য, কিন্তু দেশকাল সময়ের প্রসারিত পট এসে ব্যক্তির জীবনকে তেমন করে জঙ্গম ও বর্ণিল করে তুলতে বাধা পায়, আর পাঠক শরীরীয়ানার বিস্তারে ক্রমশঃই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। সাপ ও তাঁতের চিত্রকল্প ছাড়া অন্য চিত্রকল্পের বিষয়গতবৈচিত্র্য সেকারণেই উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে উপেক্ষিত। তা ছাড়া থীম বিভাজনের হিসেব-পত্র কষতে বসে আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করব উপন্যাসটির ১ম বৃত্তে কাহিনীর উপকরণ বৈচিত্র্য যেমন বেশি, চিত্রকল্পের বৈচিত্র্যও তেমনি বেশি, ২য় বৃত্তে চিত্রকল্পের পরিমাণ যথেষ্ট, কিন্তু প্লটের (এস্থলে) যেমন বৈচিত্র্য নেই, চিত্রকল্পও তাই নানামুখী নয়। ৩য় বৃত্তের গুরুত্ব কম বলেই চিত্রকল্পের পরিমাণ বা বৈচিত্র্য নেই।

॥ ৩ ॥

একটি বালুচরী শাড়ী তৈরি হয় অনেক দিন ধরে নানা বর্ণের সুতোয়। তার পাড়ে, আঁচলে জমিনে থাকা এক দুই বা তিনটে নকশা যা স্বতন্ত্রভাবে, তেমনি

সামগ্রিক ভাবে দ্রষ্টব্য। তেমনি আলোচ্য উপন্যাসটিতে চিত্রকল্পের নানা ধরনের কিছু কিছু আগে তুলে ধরা যাক। Susane M. Keane বলেন "কিছু কিছু লেখকের কাছে চিত্রকল্পের ধারণা বলতে বোঝায় কিছু স্পর্শগ্রাহ্য সহজবোধ্য মূর্ত প্রসঙ্গে অত্যুজ্জ্বল বা চিত্রবৎ উদ্ঘাটন।"[৩] সমরেশ বসুর ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য হতে পারে। 'টানাপোড়েন' যেহেতু প্রধানত দৃষ্টিনন্দন শিল্পবস্তুর নির্মাণ বিষয়ক, তাই এখানে দৃষ্টিগ্রাহ্য চিত্রকল্পের সংখ্যাই বেশি। কোথাও কোথাও তা দৃষ্টিগ্রাহ্য থেকে শ্রুতিগ্রাহ্য হয়েছে। যেমন—"ইয়ার পরের কথাগুলান মোতির কানে যেন খটখটির মাকুর মতো জোরে থাবড়াতে লাগল।" (পৃ. ৬৬) এর পাশে অনুভবগ্রাহ্য চিত্রকল্পও মিলবে। যেমন—"ছা কোলে বউটি বলল, মোতির হিসাবের টানায় চৌতারের জট পাকিয়ে দিয়ে।" (পৃ. ৭০) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্রকল্পগুলির যদি প্রজাতি বিভাজনে নামি তাহলে আমরা দেখব ঐ উপন্যাসে আছে নিম্নোক্ত প্রকারের চিত্রকল্প। যেমন—

(ক) প্রাণীবিষয়ক—'শিয়রচাঁদা সাপিনীটা যতোই কালো চোখের তারায় হেনে, দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরুক, জগতের প্রাণে স্বস্তি থাকতো না।' (পৃ. ৯) এ ধরনের চিত্রকল্পই এ উপন্যাসে বেশি। সেখানে সাপ ছাড়াও ষাঁড় (১১৭), চিতা (১২৯), ছাগল (১২১), রেশমগুটি (১৩৬), শুঁয়োপোকা (১৪৯), উদবেড়াল (১১), পাখি (১১), বক (৬৫), টেংকনা পাখি (৬১), কেতর (৯৩) প্রভৃতি প্রাণীর চিত্রকল্প আছে।

অনাবশ্যক বিস্তার হ্রাসের জন্য প্রত্যেকটির উদাহরণ না দিয়ে পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করলাম মাত্র। উল্লিখিত প্রাণীবিশেষের চিত্রকল্প কিন্তু অন্য পৃষ্ঠাতেও আছে। (খ) তাঁতে প্রস্তুত বা ব্যবহার্য উপকরণ—i) 'কালো রঙ করা তসরের সুতোর দলার মতো গাল চোপসানো··· (পৃ. ১), ii) না, মোতি যদি পেটলরাজে, টুকি মাকু ফাবড়ায়।' (পৃ. ৯৩) প্রথম উদাহরণটিতে দৃষ্টি গ্রাহ্যতার মধ্যেই চিত্রকল্পটি ফুরিয়ে যায়। কিন্তু ২য় উদাহরণে পেটলরাজ এবং মাকু এই দুটি তাঁতের প্রত্যঙ্গ ও 'ফারড়ায়' নামক উপরোক্ত দুটি প্রত্যঙ্গের সক্রিয়তা বিষয়ক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করে লেখক তাঁত শিল্পী পাঁচুর জীবনে তার স্ত্রী মোতি এবং যোগেন বীটের বৌ তার প্রেমিক টুকির সক্রিয়তাকে দেখান, এই সূত্রেই আসে পাঁচুর হৃদয়ে নকশা-বোনার কথা।

(গ) প্রকৃতিবিষয়ক—সমরেশ বসুর লেখায় প্রকৃতিবিষয়ক দৃষ্টি ও শ্রুতিগ্রাহ্য

সুবোধ্য চিত্রকল্প বিরল নয়। (i) তার কলসী ওলটানো বগবগে হাসি ভেসে এলো। (পৃ. ৬) (ii) এমন নাকি মোতির গতর টসেছিল। জমি যেমনকার তেমনি তবু দেখ, খরা অজন্মার মতো, সব যেন শুকিয়ে পুড়িয়ে ছারখার।' (পৃ. ৫১) (iii) মোতির বুক থেকে একটা দমকা নিশ্বাস ঝোড়ো হাওয়ার মতো উঠল। কিন্তু ঘূর্ণির মতো পাক খেয়ে বুকের ভিতরেই আছাড়ি পাছাড়ি করল। (পৃ.৫৯) সবকটিই গ্রামীণ প্রকৃতি সংলগ্ন এবং উদ্যুক্ত প্রকৃতি থেকে সংগৃহীত।

(ঘ) অপ্রাকৃত—এ উপন্যাসে বা অন্য উপন্যাসে অপ্রাকৃত বিষয়ক চিত্রকল্প বিরল। এখানে যেমন পাই—'টুকির ডাকিনী হাঁক শোনা গেল,···' (পৃ. ৬৫)

(ঙ) পৌরাণিক—যেমন, 'যোগেন ঘরকে থাকলে দুঃশাসনের বুক ফালা ফালা করে রক্ত খেত্য।' (পৃ. ১২৩) এখানে পাঁচুর মদ খাওয়ার সঙ্গী ছোট ঠাকুর যোগেন বীটের বাড়িতে তার চিরশত্রু পাঁচুর উপস্থিতি প্রসঙ্গে এমন মন্তব্য করেছে। পৌরাণিক বিষয় উত্থাপনের ক্ষেত্রে দুর্গা কেন্দ্রীক চিত্রকল্পের সংখ্যা বেশি। যেমন—i) 'এতক্ষণ বুকের ঢাকের দগরে বিসর্জনের বোল বাজছিল।' (পৃ. ১১২) ঢাকের শব্দ অবশ্য অন্য দেব-দেবী পুজাতেও ব্যবহৃত হতে পারে, তবে মনে রাখতে হবে সমরেশ এ সব প্রসঙ্গে দুর্গা ছাড়া অন্য কোনো দেব-দেবীর উল্লেখ করেননি। (ii) 'তাছাড়া পাঁচুর এখন মনে পড়ে গেল, ঘণ্টা কাবার হয় নাই, খোগেনের বউ যমুনায় মহিষ-মর্দিনী দেখিয়ে এসেছে'। (পৃ. ১২০)

(চ) নিষ্প্রাণ বস্তুতে সপ্রাণত্ব আরোপমূলক চিত্রকল্প—'বেশি বৃষ্টি হলেই রেশম সুতো মোটা হয়ে যায়। ই, উয়াদের তখন ঠাণ্ডা লাগে।' (পৃ. ১৭৩)

এরকম ভাগ আরও করা চলে। আপাতত সে কাজে আমরা নামছি না। পূর্বোক্ত বিভাজন থেকে দেখা যায় তাঁত, তাঁতের যন্ত্র, তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, তাঁতে প্রস্তুত বা ব্যবহার্য উপকরণের চিত্রকল্প এ উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে। লেখক সুনিশ্চিতভাবেই বিশেষবৃত্তির যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরার মানসেই বেছে নেন। এক্ষেত্রে পূর্বসূরী তারাশঙ্করের প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই সমরেশের চোখের সামনে ছিল। আঞ্চলিক ভাষা, বিশেষ বৃত্তিগত শব্দ বা বাক্যাংশ ব্যবহার চিত্রকল্পের এই বিশেষ ধরন পরিস্ফুটনে সহায়ক, অন্যভাবে বলা যেতে পারে আঞ্চলিকতা বা বৃত্তিগত আবহ ফোটাতেই এ ধরনের চিত্রকল্পের উপযোগিতা আছে। তাছাড়া এতে পাঠক-মনে রচিত হয় বিষয়-ঘনত্ব, এক ধরনের আবিষ্টতা আসে যার প্রভাবে। তারাশঙ্কর এবং সমরেশ দুজনেই কিন্তু আঞ্চলিক উপন্যাস

রচনার যে পরিশ্রমসাধ্য প্রস্তুতি তা সাধ্যমত করেছেন, উভয়ের জীবনবৃত্তান্ত থেকে এর বহিরঙ্গ এবং নির্দিষ্ট রচনাগুলি থেকে এর অন্তরঙ্গ পরিচয় মেলে।

'টানাপোড়েন' উপন্যাসে সাপের চিত্রকল্প যথেষ্ট। সাপ সম্পর্কে নানা বিশ্বাস বা সংস্কার ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে। জীবন ও মৃত্যু, আলো ও অন্ধকার, সু ও কু, প্রজ্ঞা এবং অন্ধ আবেগ, রোগমুক্তি এবং বিষক্রিয়া, রক্ষক ও ধ্বংসকারী, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক পুনর্জীবন লাভ—এ সব বিপরীত কোটির বিশ্বাস সাপ প্রসঙ্গে চলে আসছে দেশে দেশে বহু যুগ ধরে।[৪] আধুনিক সাহিত্যে এ সবের ব্যবহার বিরল। সাধারণভাবে অতর্কিত আক্রমণ এবং যৌণতার চিত্রকল্পই আধুনিক সাহিত্যে বেশি ব্যবহৃত হয় ও হচ্ছে। সমরেশ 'টানাপোড়েন' উপন্যাসে কামনা এবং রিরংসা প্রকাশার্থেই সাপের চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। থীম যেহেতু তাঁতিদের জীবন তাই তাঁত অনুষঙ্গী চিত্রকল্প এবং পাঁচুর অবরুদ্ধ পরকীয়া রিরংসা যেহেতু উপন্যাসে গুরুত্ব পায় তাই সাপের নানা চিত্রকল্প এ উপন্যাসের শিল্পায়নে অত্যন্ত সহায়কই হয়েছে বলা যেতে পারে। এ উপন্যাসের সাপের চিত্রকল্পগুলিকে নিশ্চয়ই অর্থগত বা গঠনগত বিভাগ করা চলে, তবে লক্ষ্য করা যাবে, তাতে বৈচিত্র্যের প্রাচুর্য নেই। তাঁত ও সাপ এ দুটি বিষয়ক পুনরাবৃত্ত চিত্রকল্প (Recurrent imagery) সহজেই আমাদের চোখে পড়ে, ফলে লেখকের অভিপ্রায় অস্পষ্ট থাকে না পাঠকের কাছে। কারণ W. M. Frohock ঠিকই বলেছেন বারংবার ব্যবহার একটি চিত্রকল্পের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তোলে।[৫] উপন্যাসটির ৯ পৃষ্ঠায় রিরংসার্থে এর প্রথম প্রয়োগ, তারপর ১০, ২৩, ৩০, ৩১, পৃষ্ঠায় আসছে একবার করে। তারপর পাঁচুর টুকির প্রতি পরকীয়া জাগরণ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় স্ত্রী মোতির ঈর্ষা ও ক্রোধের প্রসঙ্গ যেখান থেকে শুরু হচ্ছে অর্থাৎ মোটামুটি ১০১ পৃষ্ঠা থেকে এই সাপের চিত্রকল্প পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। যেমন—"সেই আঁকুড় আর বর্ণার ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে এক সোনার অঙ্গ শিয়রচাঁদা সাপিনী সড়সড়িয়ে চলে।" (পৃ. ১০১) একই সাপের উপমান আসছে দুই স্ত্রীলোক মোতি ও টুকি সম্পর্কে। i) "উয়াকে তুমি খরিশ নজরে দ্যাখ ক্যানে যোগেনের বউ?" (পৃ. ১১৯) [যোগেনের বউ = টুকি] ii) "ই, জবাব কে দিবে? ঘরের কোণে খরিশ ফুঁসছে।" (পৃ. ১৬৩) [এখানে মোতি প্রসঙ্গে বলা হচ্ছে] লোকসংস্কৃতির আলোচকদের মতে শঙ্খলাগা অন্যত্র অশুভ-সূচক হলেও বাংলাদেশে শুভসূচক।[৬] 'টানাপোড়েন' উপন্যাসে এর সুন্দর ব্যবহার

আছে। "ই, ই দ্যাখ, শিয়রচাঁদা সাপিনী দুহাত বাড়িয়ে চন্দ্রবোড়াকে জড়াই ধরে। না, এখন আর পাঁচুর বুকে আতুর পাতুর ডাক ছাড়ে না, কে মেমায়, কে মেমায়? এখন শিয়রচাঁদার জোড়া অঙ্গে, চন্দ্রবোড়া যেন আপন শরীরে বিশাল হয়ে ওঠে। নিশ্বাসে ফোঁস ফোঁস করে।" (পৃ. ১৯২) [আলোচ্য উদাহরণে শিয়রচাঁদা বলতে টুকিকে এবং চন্দ্রবোড়া বলতে পাঁচুকে বোঝানো হচ্ছে।] আর এক জায়গায় পাই—"সোনার পিতিমেখানি শিয়রচাঁদার রূপ ধরে, চন্দ্রবোড়াটির গায়ে জড়াজড়ি করে শঙ্খ লাগা করে।" (পৃ. ২০৭)

"পুনরাবৃত্ত চিত্রকল্পের আর একটি ধরন হল ঔপন্যাসিক একটি বিশেষ চিত্রকল্পকে একটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অনুচ্ছেদে বিস্তৃত করে উপস্থিত করেন, ভেহিকল ও টেনর-এর সাদৃশ্যের নানা উপপর্যায়কে টেনে আনেন, ফলে চিত্রকল্পটি একটি বিস্তৃতি ও (সার্থক প্রয়োগ হলে) দৃঢ়মূল ভিত্তি পেয়ে যায়।"[৭] সদ্যোদ্ধৃত পৃ. ১৯২-এর উদাহরণটি নিশ্চয়ই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এরকম উদাহরণ আরও ২/১ জায়গায় নিশ্চয়ই আছে। উপন্যাসটিতে যেহেতু ইন্দ্রিয়বেদ্যতার প্রাধান্য, লেখকও যেহেতু চিত্রকল্প বেছে নেন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে তাই বিমূর্ত বিষয়ের চিত্রকল্প এ উপন্যাসে কম। এরকম দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে:— মানুষের জীবনই যে একটা বড় নকশা, জীবন ক্রমশ বোনা হয়ে চলে, এই উপলব্ধির টানে তিনি চিত্রকল্পের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেন। তখন সচল তাঁত ব্যক্তিজীবনের চিত্রকল্প হয়ে ওঠে আবার ব্যক্তিজীবন উন্নীত হয় নির্বিশেষ জীবনে। i) 'খাপি জমিনের সংসার কি তবে সোনামুখী আর কিষ্টগঞ্জের বিটিদের ঘরে?' (পৃ. ৪). ii) 'উয়ারা যে অর্ধপুতা। যাকে বলে অর্ধপোতা। তা মিছা কথা লয় বটে। তাঁতীর সারা জীবন মাটিতে অর্ধেক পোতা থাকে।' (পৃ. ১৬) iii) মোতির বুকে যেন পাষাণ লড়ির ঝাপ পড়লো, বুকের ঘরে দক্তি টানায় খাপি সুতোয় দম চাপা।" (পৃ. ৭১) শিল্পীর মনোজগতে শিল্পের উদ্ভাস নিয়ে সমরেশ বসু এ উপন্যাসে একটি চমৎকার চিত্রকল্প উপস্থিত করেছেন। তা হল—"মাথায় যদি নকশা বুকের শিকড় থাকে, তবে বুকের ডালে পাতাছাড়ে ফুল ফোটে। নকশা তুমি কোথায়? জগত সংসারকে যে রূপসী করে সাজায়, সেই অলক্ষ্যের মরমে।" (পৃ. ২২) কথকের বাচন ভঙ্গিমায় এইভাবে তিনি শিল্পের রহস্য, শিল্পীর অভিলাষকে তুলে ধরে উপন্যাসটির ভাবগভীরতা বর্ধনে সচেষ্ট হন। অবশ্য অনেক পাঠকই জানেন এ চিত্রকল্পটি অন্য লেখকের হাতেও ইতিপূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। নির্বিশেষ জীবনের চিত্র-

কল্প হিসাবে যেমন তাঁতের অনুষঙ্গ ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনি এসেছে গুটপোকা। সমরেশ বসু, যিনি 'কালকূট'নামীয় লেখকও বটে, আনেন জীবন সম্পর্কে এক অধ্যাত্ম-দার্শনিক উপলব্ধি নিম্নোক্ত উদাহরণে—"ইবা রে বুঝ হে, সংসারের ধর্ম কর্ম গতি বাগ কেমন কোনদিকে। তুমিও এক গুটির মধ্যে আপনাকে বন্ধন করেচ। উট পাঁচুর বাপ জগত কীতের গীত বটে : ঘর বাঁধা করচি আমি/তুঁত গাছে আর শাল গাছে।/ উ-ঘরের ভিতরে মরণ আমার/ভ্যাখ ক্যানে, তালাই বেঁন্ধে লিয়া খাঁইচে।" (পৃ. ১৩৬) এইখানে বলে নেওয়া যায় যে রূপান্তরিত (Transformed) বা নবমূল্যপ্রাপ্ত (Revalued) চিত্রকল্প সমরেশ বসুর এ উপন্যাসে নেই। এখানে যা ব্যবহার তা ঐতিহ্যগত। একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন —"প্রত্যেক চিত্রকল্পেই অবশ্য থাকা চাই কিছু একটা বিযুক্ত করার মতো এবং কিছু অপ্রত্যাশিত অর্থ, দুটি আপাত অসম অভিজ্ঞতার মধ্যে কোনো এক সদৃশ উপাদান আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে আনতেই হবে এক চমকপ্রদ প্রতিক্রিয়া।" সমরেশ বসু কি এ উপন্যাসে তা পেরেছেন? আমরা দেখেছি চিত্রকল্পের উপকরণ অনেকক্ষেত্রে প্রথাসিদ্ধ (যেমন, সাপ) কিন্তু তাঁতের যন্ত্রাংশ বিষয়ক চিত্রকল্প নিশ্চয়ই নতুন প্রয়োগে, ইতিপূর্বে আর কোনো লেখকের লেখায় আমরা তা পাইনি। আর সাদৃশ্য সন্ধান অব্যর্থ বলেই তা আমাদের অপ্রত্যাশিতের চমক দিয়ে বিযুক্ত করে এবং আমরা লেখকের শৈল্পিক সিদ্ধির পরিচয় পেয়ে আনন্দ অনুভব করি।

গঠনগত চিত্রকল্পের পরিচয়ে নামা যেতে পারে। Stephen Ullmann যিনি ফরাসি উপন্যাসে চিত্রকল্প নিয়ে বিস্তৃত কাজ করেছেন, Vehicle (যার সঙ্গে তুলনা), Tenor (উদ্দিষ্ট বিষয়) এবং Ground (পূর্বোক্ত দুয়ের সাদৃশ্যের ভিত্তি) এই তিনের দিক থেকে কয়েকটি বিভাজন করতে চান। তা হল—

(ক) Vehicle অনুযায়ী চিত্রকল্প—লেখকের নিজস্বপ্রবণতা, বৃত্তি, তাঁর অধ্যয়ন, পরিপার্শ্বের সঙ্গে অভিযোজন প্রভৃতির ওপর এ ধরনের চিত্রকল্প নির্ভরশীল। কেউ কেউ এটা মানতে চান না, কিন্তু তবু এর সারবত্তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রসঙ্গত সার্ত্র-এর উপন্যাসে পতঙ্গ-চিত্রকল্পের কথা তোলা যায়। Les Mouches নাটকে, La Nausee´ ও La Mort Dans L'âme প্রভৃতি উপন্যাসে তা সহজদৃষ্ট। সমালোচকরা বলেছেন এই বিশেষ চিত্রকল্পের বারংবার ব্যবহার করা হয়েছে মানুষের শারীরিক ও মানসিক হীনতা প্রকাশ করতেই। সেই সঙ্গে লক্ষণীয়, কল্পনার অনুপুঙ্খতা এবং দার্শনিক ভাববস্তুও এখানে মিলে

মিশে যায়। ফলে এই বিশেষ চিত্রকল্প শুধু মানবচরিত্রের আতঙ্কবিস্তারী বা বিভ্রমাত্মক দিকটাই তুলে ধরে না, তুলে ধরে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বক্তব্যও। সমরেশ বসু সেরকম কোনো দার্শনিক প্রত্যয়ের প্রবক্তা নন। তবে মানুষের পাশব-প্রবণতা পরিস্ফুটনে তিনি বৌদ্ধিক প্রবণতা পরিস্ফুটন অপেক্ষা অধিকতর আগ্রহ পোষণ করেন। এর ফলে পাশব প্রবণতার শিল্পায়ন উপযোগী চিত্রকল্প সংগ্রহ করেন তিনি পশু জগৎ থেকেই বেশি। 'টানাপোড়েন' উপন্যাসে আমরা দেখব যৌনাকর্ষণ বোঝাতে সাপের চিত্রকল্পের বারংবার ব্যবহার আসে। এখানে যেন Tenor অপেক্ষা Vehicle এর দাবিটাই বেশি। একথা বলার কারণ যৌনাকর্ষণ তো অন্য ধরনের চিত্রকল্প মারফৎ প্রকাশ করা যেত। (আলোচ্য প্রবন্ধে সাপের চিত্রকল্পের বহু উদাহরণ সন্নিবিষ্ট হওয়ায় এখানে আর উদাহরণ দেওয়া হল না।)

(খ) Tenor অনুযায়ী চিত্রকল্প—এখানে লেখক যে জীবনের গল্প বলতে চান, যে জীবনকে তিনি চিত্রকল্পের ভাষায় উপস্থিত করতে চান সেই জীবনই যেন চিত্রকল্পের জগৎকে নির্বাচন করে।

এ প্রসঙ্গে Sperber দু ধরনের কেন্দ্রের কথা বলেছিলেন, যা সাদৃশ্যায়নের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাহল—প্রসার কেন্দ্র—যা তুলনার শর্তগুলি যোগান দেয়। আর একটি হল—আকর্ষণ কেন্দ্র—যার প্রয়োজন তুলনার এই শর্তগুলি। কোনো সাহিত্যকর্মের চিত্রকল্পের প্যাটার্ন-এর সমগ্র ছবিটা পেতে হলে এই প্রসারণ এবং আকর্ষণ কেন্দ্র দুটিকে আগে চিহ্নিত করে নিতে হবে। এভাবেই কখনো কখনো কোনো কোনো ভাবক্ষেত্র দুই ব্যাপারেই ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। প্রুস্তের উপন্যাসে যেমন সংগীত—যা চিত্রকল্পের প্রসারণের ঊর্ধ্ব কেন্দ্র আর একই সঙ্গে নানামুখী আকর্ষণের কেন্দ্রও বটে। জীবিকাশ্রয়ী উপন্যাসে লেখকের প্রবণতা স্বভাবতঃই এ দুদিকে যাবে আমরা আশা করতে পারি। 'টানাপোড়েন' বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ী নির্মাতা তাঁতীদের জীবনালেখ্য। তাই, তাঁতী তাঁতের যন্ত্রাংশ, উপকরণ Tenor-এর অর্থগত হিসেবে প্রসারণ কেন্দ্রও বটে, আবার লেখক যখন মানবজীবনের দৃশ্য, শ্রুতি, গতি, স্বভাব প্রভৃতি বোঝাতে তাঁত ও তার অনুসঙ্গী যাবতীয় কিছুকে পরিভাষা সমেত ব্যবহার করেন তখন তা যুগপৎ আকর্ষণ-কেন্দ্রও হয়ে ওঠে। বুদ্ধের মুখাবয়বের সঙ্গে কালো রঙ করা তসরের সুতোর দলার তুলনা, মানুষের বুকে খটখটির মাকু চলা প্রভৃতি দৃশ্য ও শ্রুতির স্তর পার হতে হতে সমরেশ অগ্রসর হয়ে যান মানবমনের আরো অনেক অনুষঙ্গ প্রকাশে। যেমন—'কিন্তু অই গ,

ই কি চোখখাগী চতুর্দশী মনের টানা, পাষাণ লড়িতে চাপ পড়ে যেন আপনা থেকেই টানা সুতোর খাড়ি উঠে যেতো।' (পৃ. ৮০)

(গ) Ground অনুযায়ী চিত্রকল্প—সাদৃশ্যের প্রকৃতি অনুযায়ী যা নির্ভরশীল। কোনো কোনো শব্দার্থবিদ বস্তুগত এবং অনুভবগত এই দুই প্রকার সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য করাটাই যথেষ্ট মনে করেন। আলোচ্য উপন্যাসে বস্তু ও অনুভব এই দুই প্রকার সাদৃশ্যের ব্যাপার থাকলেও গ্রাউণ্ড অনুযায়ী চিত্রকল্পের নির্বাচনের ব্যাপারটি তেমন ভাবে এখানে সক্রিয় নয়।

Tenor ও Vehicle এর সম্পর্ক নির্ণয় করতে গিয়ে অনেক সময় দেখা যায় এ দুটির একটি, কোনো মূর্ত বা কোনো বিমূর্ত ধারণার বাহক হয়ে ওঠে। সমরেশ 'টানাপোড়েন' উপন্যাসে সে রকম ব্যবহার নিশ্চয়ই করেছেন। যেমন—'তুমিও এক লসকা বটে, বড় জবর লসকা। আজ লসকাদারের মন প্রাণের ঠিক নাই।' (পৃ. ১৪৪) বালুচরী শাড়ীর বিখ্যাত শিল্পী অভয়খান ওস্তাদের কাছে তার পুত্রবৎ সহকারী পাঁচু একটি নকশার রূপরেখা নিয়ে গিয়ে ভয়ে ভয়ে ছিল। কারণ ওস্তাদের কাছে স্বীকৃতি লাভ বড় কঠিন। সেই দুর্লভ স্বীকৃতি লাভের পর সে যখন ফিরছে তখন যোগেন বীটের বাড়ির পাশ দিয়ে আসার সময় পাঁচুর মনে জেগে ওঠে যোগেনের বাঁজা কিন্তু সুঠাম শরীরী বৌ টুকির সান্নিধ্যের কামনা। মনের মধ্যে শিল্পীর দুর্লভ স্বীকৃতি লাভের উত্তেজনা আবার অবরুদ্ধ প্রেমের জাগরণ এই দুই বিমূর্ত উপকরণ কিভাবে খেলা করে, মনে তার প্রভাব কতটুকু, কিভাবে চেতন বহির্ভূত মনোজগতের এই সক্রিয়তা সত্যই এক 'জবর লস্‌কা', সার্থক শিল্পীই একমাত্র এই জটিলতাকে তার যাথার্থ্যে উপস্থিত করতে পারেন আমাদের কাছে। কখনো কখনো Tenor বিমূর্ত Vehicle মূর্ত এমন চিত্রকল্প এ উপন্যাসে আমরা পাই। যেমন—'খাপি জমিনের সংসার কি তবে সোনামুখী আর কিষ্টগঞ্জের বিটিদের ঘরে?' (পৃ. ৪) সমরেশ vehicle-কে সাধারণত বিমূর্ত করেন না। কখনো কখনো চিত্রকল্পে Tenor অনুল্লিখিত থেকে যায়। এমন উদাহরণ 'উ ঘুগি বটে, লসকার সোহাগ শুনে আনতাবড়ি আনজাদি কেঁচা বিঁধা করছে। লেগে যায় তো একখান মাছ গেঁথে যাবে।' (পৃ. ১৫০) 'কেঁচা' অর্থে প্রলোভন বিস্তার এবং 'মাছ' অর্থে সম্ভাব্য প্রলুব্ধ ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে এখানে। অর্থাৎ উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উল্লেখ নেই। Ullmann যে explicit ও implicit চিত্রকল্পের কথা বলেছেন, সেই সূত্রে বলা যায় সমরেশ বসুর আলোচ্য উপন্যাসে যে কোনো ধরনের চিত্রকল্পই একটু

বেশি মাত্রায় explicit. এ উপন্যাসে ঘটনার ও চরিত্রের বিকাশে গতির পরিমাণ কম। কিন্তু গতিচিত্রকল্প বেশ কিছু আছে। যেমন—'খুনি যেন তল পেত না, কিন্তু ওর চতুর্দশী শরীর যেন ঝটকা বাতাসে জলের মতো শিউরে উঠত।' (পৃ. ৮০) 'সেই আঁকুড় আর বর্ণার ঝোপ ঝাড়ের আড়ালে এক সোনার অঙ্গ শিয়ড়চাঁদা সাপিনী সড়সড়িয়ে চলে।' (পৃ. ১০১) দুটিই গতিচিত্রকল্প, Vehicleটা আলাদা মাত্র। যেহেতু উপন্যাসটি তাঁত শিল্প বিষয়ক, তাই বর্ণ চিত্রকল্প সন্ধান পাওয়াটাও শ্রমসাধ্য নয়। যেমন—'জগতের খালি গা, পুরনো কালো ফিতা পাড় কোঁচকানো তসরের মতো গা।' (পৃ. ২) একটি অঞ্চল, সেই অঞ্চলের বিশেষ বৃত্তিধারী মানুষ—তার উপস্থাপনা সমরেশের অন্বিষ্ট বলেই যেমন উপন্যাসের শেষে আসে আঞ্চলিক উৎসবের কথা (ভাদ্রমাসের জীতাষ্টমীতে শিয়াল শুকনি পরব, পৃ. ২১৮) তেমনি আসে প্রবচনাত্মক চিত্রকল্প। যেমন—'অহ হে, হাড়িকাঠ মেমায়, না ছাগল মেমায় ?' (পৃ. ৬) এই চিত্রকল্পই—রিপুর আকর্ষণে, আসক্তিতে সমর্পণ—ব্যবহৃত হয়েছে একাধিকবার, যেমন, পৃ. ১২১-এ। I. A. Richards তাঁর Speculative Instruments বইতে বলেছেন চিত্রকল্পের দুটি মৌল ধরনের—কার্মিক (Functional) ও আলঙ্কারিক (Ornamental)—কথা। আলোচ্য উপন্যাসে এ দুটি ধরনই আছে সেটা যে-কোনো পাঠকই বুঝতে পারেন। সমরেশ যখন পাঁচুর বাবা বৃদ্ধ জগতের প্রসঙ্গে বলেন 'পুরানো কালো ফিতা পাড় কোঁচকানো তসরের মতো গা।' (পৃ. ২) তখন তা হয় আলঙ্কারিক আর যখন লেখেন—'মোতির বুকে যেন পাষাণ লড়ির ঝাপ পড়লো, বুকের ঘরে দক্তি টানায় খাপি সুতোয় দম চাপা' (পৃ. ৭১) তখন তা হয়ে যায় 'কার্মিক'। এ প্রসঙ্গে এটাও আমাদের চোখে না পড়ে পারে না যে চিত্রকল্প বর্ণনা অংশেই বেশি, যদিও সংলাপ অংশেও তার উদাহরণ দেওয়া যাবে। যেমন—মোতি বলল, 'লসকাখানি ওস্তাদের লজর ধরা হবেক কি না হবেক, এখন উইটি উয়ার দশরা একাদশী শাঁওনের সপ্তমী। (পৃ. ৮৮) কিংবা 'শিয়ড়চাঁদার গলায় এখন রক্তের ঝাপটা স্বর, ফুটতে চায় না, তবু বলে, 'ই গ লসকাদার' আমার খালি জমিনে লসকা দিয়া কর, লসকায় লসকায় ভর্যে দিয়া কর।' (পৃ. ১৯৩) আমরা দেখতে পাচ্ছি উপন্যাসের অনেক জায়গাতেই বর্ণনা এবং সংলাপের ব্যবধান লেখক লোপ করে দিয়েছেন। এতে আঞ্চলিকতার স্বাদটি যেমন সর্বত্রচারী হয়েছে, তেমনি অনালঙ্কারিক ভাষা উন্নীত হয় আলঙ্কারিকতা নিয়ে আর চিত্রকল্পের বয়ন গড়ে তোলে উপন্যাসরূপ বালুচরীতে নানান উজ্জ্বল

নকশা। পাঠক বিযুক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সেদিকে।

Miss Christine Brooke Rose তাঁর **A Grammar of Metaphor** বইতে মেটাফরে সকর্মক ও অকর্মক ক্রিয়ার বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন। তিনি বিশেষ্যাত্মক মেটাফরের ব্যাপারটিতেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেন। তবে তাঁর আগ্রহ মেটাফরের ব্যাকরণগত উপস্থাপনাতে যতখানি, বিষয়ের সঙ্গে বা বাস্তবতার সঙ্গে সম্পর্ক নির্ণয়ের ততটা নয়। সমরেশ বসু, আমরা আগেই বলেছি, অতিমাত্রায় অলঙ্কারের বৈচিত্র্যসচেতন লেখক নন। তবুও আমাদের সীমিত সামর্থ্য নিয়ে আমরা বৈচিত্র্য উপস্থিত করতে সচেষ্ট হয়েছি। ব্যাকরণগত দিক থেকেই কয়েকটি উদাহরণ রাখা যাক 'টানাপোড়েন' উপন্যাস থেকে।

(ক) বিশেষ্য—মেটাফর—'ই, জবাব কে দিবে? ঘরের কোণে খরিশ ফুঁসছে।
(পৃ. ১৬৩) এখানে পাঁচুর ক্রুদ্ধ বৌ মোতির সঙ্গে খরিশের তুলনা করা হয়েছে।

(খ) বিশেষ্য—মেটাফর (র/এর যুক্ত) (Genitive link)—'আপি জমিনের সংসার কি তবে সোনামুখী আর কিষ্টগঞ্জের বিটিদের ঘরে?' (পৃ. ৪)

(গ) বিশেষণ—মেটাফর—এরই প্রয়োগ এ উপন্যাসে বেশি। যেমন—খরিশ কোঁসানি (পৃ. ৬৩), কলসী ওলটানো বগবগে হাসি (পৃ. ৬), ভোমরা কালো ঝিলিক (পৃ. ১৮৫) ইত্যাদি।

(ঘ) সকর্মক ক্রিয়া-মেটাফর—পাঁচুর বুকের টানায় যেন চৌতারের জট পাকিয়ে গেল (পৃ. ১২২)

আমরা পৌঁছে গেছি আমাদের সাধ্যানুযায়ী আলোচনার সীমান্তে। চিত্রকল্প রচনার মনস্তত্ত্বনির্ণয় খুব সহজ ব্যাপার নয়, বলেছেন এক সমালোচক। উপন্যাস বিশ্লেষণ, চিত্রকল্প সংস্থাপনের অলি গলি বেয়ে আমরা নিশ্চয়ই চলে যেতে পারি সৃজনকর্তার মনের অন্দর-মহলে। কেন একজন লেখক অমুক অমুক ধরনের চিত্রকল্প বেছে নেন, কেন অমুক অমুক ধরন বর্জন করেন, কেন বিশেষ ধরনের চিত্রকল্প-যুক্ত ভাষায় উপন্যাসের ভাববস্তু উপস্থিত করতে একজন লেখক সহজ স্বাভাবিকতা বোধ করেন, অন্যক্ষেত্রে কেন করেন না এরও তো একটা ব্যাখ্যা, যত অস্পষ্ট বা রহস্যময় হোক, আছে। অন্যান্য শিল্পের মতো উপন্যাস শিল্পেরও অন্তত তিনটি অভিপ্রায় (Intention) লক্ষ্য করা যায় বলেছেন **Dorothea Krook**

তাঁর একটি প্রবন্ধে। সে তিনটি হল—(ক) লেখকের অভিপ্রায় যা লেখক মনের সঙ্গে একান্তভাবেই সম্পর্কিত বলেই বোধহয় আত্মপ্রকাশী (খ) কৃত অভিপ্রায় যা শিল্পের অন্তর্গত বলেই বস্তুনিষ্ঠ বলা যেতে পারে। (গ) মনস্তাত্ত্বিক—লেখক তাঁর অচেতন, অবচেতন এবং চেতন মনের কোনো ভয়, দুশ্চিন্তা, নিগ্রহ, বঞ্চনা বা ব্যক্তিক যন্ত্রণার ধাক্কায় লেখক কোনো কোনো লেখা লিখতেই পারেন। যদিও অনেকে এ পদ্ধতিতে আপত্তি জানিয়েছেন, তবু অনেকেই আবার এ পদ্ধতিকে একেবারে উড়িয়ে দিতে নারাজ। সমরেশের গল্পে রাজনীতি, নানান সামাজিক প্রসঙ্গ থাকলেও প্রেমের শরীরীয়ানা একটি বড় বিষয়। প্রেম বা প্রেমহীনতা যে পথেই তিনি শিল্পায়নে প্রবৃত্ত হন, প্রেমের বা প্রেমহীনতার মনন বা অনুভবের অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল কিন্তু বিচিত্র আলো-অন্ধকারের পরিবর্তে শরীরীয়ানাই যেন তাঁকে বড় বেশি টানে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও এই মনোবৃত্তির ব্যাপকতা লক্ষ্য করার মতো। গৌরী দেবীর মতো অশেষ গুণশীলা, তাঁর সাহিত্যজীবন বিকাশের একান্ত প্রেরণা এই ভদ্রমহিলা জীবিত থাকতেও তাঁরই কনিষ্ঠা ধরিত্রী দেবীকে বিবাহ মনোকর্ষণের পক্ষে ব্যাখ্যা করব কি করে? সমরেশ বসুর জীবন ও সাহিত্যের বিস্তৃত তথ্যসংগ্রাহক ডঃ নিতাই বসু উল্লেখ করেন, বিহার ও উড়িষ্যার সীমান্তবর্তী সারেণ্ডার গভীর জঙ্গলে গিয়ে থাকার সময়ে সমরেশ জড়িয়ে পড়েন একটি মুণ্ডা মেয়ের সঙ্গে। তাদের সমাজ মেয়েটিকে বিয়ে করতে বললে সমরেশ রাজি হন। রাম বসু কৌশলে সমরেশকে ঢাকে চাপিয়ে ফিরিয়ে আনেন। নিতাইবাবু আরও জানান, তাঁর নারীর কাছে যাওয়া এবং তাঁর কাছে নারীদের নিরন্তর আসার সংবাদ তাঁর পরিবারের কারও কাছে অজানা থাকে না। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিতাইবাবুকে জানান নারী সম্পর্কে সমরেশবাবু প্রেমিক মানুষ। উনি নারীদের নারীত্বকে, বাইরের সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন। তাঁর বাল্যবন্ধু সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মেয়েদের সঙ্গে সমরেশের ঘনিষ্ঠতা কিন্তু স্থায়ী হয় না। এক একটা ফেজ আসে এবং চলে যায়। এমনকি স্থায়ী হবার অবকাশও যদি কখনো ঘটে থাকে ও কিন্তু নিজেই স্থায়ী হতে দেয় না। সমরেশ বাবুর ছেলে দেবকুমারও বললেন—মেয়েদের সান্নিধ্য সম্পর্কে ওঁর কোনো ছুঁৎমার্গিতা নেই। নিতাই বাবু খোদ সমরেশের উক্তি এ ভাবে উপস্থিত করেন—"হ্যাঁ, আমার কারুর সঙ্গে হয়ত খুবই ঘনিষ্ঠতা হয়, তারপর হয়ত মেয়েটির বিবাহ হয়ে গেল, কিংবা, অন্য কারুর সাথে প্রেমে হাবুডুবু খেতে খেতে দূরে সরে গেল। আবার হয়ত দেড় বছর

আমার কাছ থেকে নড়ছে না। কোনো সময়ে আমাকেই বলতে হয়েছে, এবার তোমাকে যেতে হবে। ...মাঝে মাঝে এদের নিয়ে নানারকম সমস্যাও দেখা দেয়। তখন সেগুলো আমাকেই সামলাতে হয়। যারা বোঝদার মেয়ে তাদের নিয়ে কোনো অসুবিধে হয় না। কিছু অবুঝ মেয়েও আসে, মেলামেশার পরেই তারা তাদের দাবি স্থাপিত করে ফেলে। তখন তাদের বোঝানো যায় না যে এটা সম্ভব নয়। এই নয় যে তোমার ভালোবাসাকে আমি মূল্য দিচ্ছি না কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা রেখে চলতে হবে। এটা তো বুঝতে হবে যে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি আর তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ।"[১২]

ওয়াকিবহাল নিতাইবাবুও বলেন, সমরেশের কাছে প্রেম অবশ্যই দেহভিত্তিক। প্রেমের ক্ষেত্রে সমরেশ তাই নিরন্তরতায় বিশ্বাস করেন না। মোপাসাঁর অবিরত নারী সঙ্গ তাঁকে জীবনে কোনদিন নারীর হৃদয় অনুসন্ধানের অবকাশ দেয়নি।... হয়তো নানা বয়সের এবং সমাজের নানাস্তরের নারীর দুর্বলতা সমরেশকেও সামান্য কিছু বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া নারীর মধ্যে প্রেমের নিষ্ঠা খুঁজতে বাধা দিয়েছে।...প্রেম বলতে আজীবন একটিমাত্র পুরুষ বা নারীতে বিলীন হয়ে থাকার সনাতন ঐতিহ্যে সমরেশ বিশ্বাস করেন না।[১৩] ব্যক্তিজীবনের এই পরিপ্রেক্ষিতকে স্মরণ রেখে আমাদের মনে আসবে 'বিবর' থেকে সমরেশের সাহিত্যে বাঁক নেওয়ার কথা। ১৯৬৫ সালে 'বিবর' প্রকাশিত হয়। এই একই কালে গৌরীর জন্য অপরাধ বোধ, ধরিত্রীর প্রতি ভালোবাসা, কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে বিরূপ ও তিক্ত সম্পর্ক এবং প্রেমের শরীরীয়ানার গল্পে উপন্যাসে একাধিপত্য লক্ষ্য করার মতো।

আমরা বলতে চাই এই অনুভবই তাঁর প্রেম বিষয়ক চিত্রকল্পে কাজ করেছে। যেহেতু 'টানাপোড়েন' উপন্যাসে প্রেমের দৈনিকতাই বেশি তাই এখানে তিনি সাপের চিত্রকল্প এবং অন্যান্য অনেক সংস্কার, শিল্প-প্রয়োগ বাদ দিয়ে শুধু যৌনতার দিকটিকেই বেছে নেন এবং অন্য কোনো নূতনত্বের দিকে যান না, বা সাপের নূতন কোনো প্রয়োগের কথা ভাবেন না। দ্বিতীয়ত সমরেশ বস্তু মানবজীবনের মৌল প্রবৃত্তিগুলিকেই তুলে ধরতে ভালোবাসেন। তাই সমরেশের গল্প উপন্যাসে প্রাণীবিষয়ক চিত্রকল্পের সংখ্যা বেশী। অন্যদিকে যেমন ব্যক্তিজীবনে তেমনি সাহিত্য জীবনে প্রেমের দৈহিকতাকে যেমন গৌণ করতে পারেন না এমনকি প্রৌঢ়ত্বেও তেমনি দেশ-কাল-সমাজের প্রতি অনুভূতিময় আগ্রহকেও একেবারে বিসর্জন দিতে পারেন না। আঞ্চলিক ও বৃত্তিগত পটের যাথার্থ্য অনুসন্ধানের তাগিদে যৌবনে

প্রাকৃতবাদীর মতো তিনি যেমন বেরিয়েছিলেন শ্যামনগর, জগদ্দল প্রভৃতির চটকল চটকলশ্রমিকদের জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় সংগ্রহে, সেই একই আগ্রহ বহমান জেলেদের, গোয়ালাদের বা বিষ্ণুপুরের তাঁতীদের জীবন অধ্যয়নে। আগ্রহের ধরনটা এক, পরিমাণগত তারতম্য থাকতেই পারে। তাঁতশিল্প সংক্রান্ত বিচিত্র উপমার চমৎকার প্রয়োগের এই নিষ্ঠার আংশিকতার ফল। এই টানাপোড়েন তো তাঁর সাহিত্যের মৌল একটি প্রসঙ্গ। এ প্রসঙ্গকে অস্বীকার করে উদাসীন থেকে তাই সমরেশ সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হওয়া নিরাপদ হবে না। চিত্রকল্পের আলোচনার ক্ষেত্রেও কথাটা একইভাবে সত্য।

॥ প্রসঙ্গ নির্দেশ ॥

১. *Image And Theme : Studies in Modern French Fiction*, ed. with an Introduction by W. M. Frohock, p. 4. Eugene Falk-এর বইটির উল্লেখ আছে এখানেই।
২. বঙ্গীয় শব্দকোষ, সাহিত্য অকাডেমী সংস্করণ, পৃ. ৯৭৮
৩. *Image And Theme* বইতে Susan M. Keane-এর Dream Imagery in the Novels of Bernanos প্রবন্ধ, p. 11.
৪. এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি 'প্রমা' পত্রিকায় প্রকাশিতব্য 'চিত্রকল্প : সর্প সংস্কৃতি' প্রবন্ধে। কৌতূহলী পাঠক *Richard Cavendish* সম্পাদিত *Man, Myth & Magic* (১০ম খণ্ড), J. C. Cooper লিখিত *An Illustrated Encyclopaedia of Traditional Symbols*, আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখিত *The sun and the serpent lore of Bengal* প্রভৃতি গ্রন্থ দেখতে পারেন।
৫. *Image and Theme* বইয়ে W. M. *Frohock*-এর ভূমিকা।
৬. শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত বই।
৭. আমার 'চিত্রকল্প : সর্প সংস্কৃতি' প্রবন্ধ থেকে।
৮. *Language And Style*—Stephen Ullmann, p. 178.
৯. *Language And Style* বইতে উল্লিখিত, p. 189.
১০. *Metaphor—Terence Hawkes* বইতে উল্লিখিত, p. 68-69.

১১. *The theory of the Novel*, ed. by John Halperin বইতে Dorothea Krook-এর Intentions and Intentions প্রবন্ধ, p. 353-54.

১২. কালকূট সমরেশ—নিতাই বসু পৃ. ১২৫-২৭, ১২৮, ১৩০।

১৩. ঐ, পৃ. ২৪৯।

পুরাতনী

প্রাচীন কলিকাতা

ইংরাজ আগমনের পূর্বে ও পরে প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

সুতালুটি প্রভৃতি স্থানের জঙ্গলময় অবস্থা—চারিদিকে বাদাভূমি—বাঘ ও ডাকাতের ভয়—সালিখা ও বেতোড় প্রভৃতি গ্রামের কথা—বেতাইচণ্ডী—মনসার ভাসান গ্রন্থে তৎকালীন স্থান-সমূহের নামোল্লেখ—ডি ব্যারোজ ও সিজার ফ্রেডরিক প্রভৃতি ইউয়োপীয়গণ কর্তৃক লিখিত প্রাচীন জনস্থানসমূহের বিবরণ—চাটগাঁ ও সাতগাঁর বন্দর—সপ্তগ্রামের উন্নত অবস্থা—ত্রিবেণী সঙ্গমের মেলা—বেতোড় ও পার্ডেনরিচ—বেতোড়ের হাট—বেতোড়ের হাটে পর্টুগীজ বাণিজ্য—সালিখা ও চিৎপুরের ক্রমোন্নতি—কুচিনান ও কলিকাতা—সপ্তগ্রামের অধঃপতন—সপ্তগ্রামবাসী শেঠ ও বসাকদের গোবিন্দপুরে আগমন—মুকুন্দরাম শেঠ ও তাঁহার প্রপৌত্র গোপীমোহন শেঠের কথা—শেঠ ও বসাকদের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—শেঠদিগের গৃহদেবতা গোবিন্দজী—ধনস্থগ্রাম বা গোবিন্দপুর—কালীঘাটের হালদার বংশ ও কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠীর আদি পুরুষদের গোবিন্দ-পুরে বাস—পুরাতন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ—সুতালুটির প্রাচীনত্ব নির্ণয়—বসাকগণ কর্তৃক সুতার ব্যবসায়—ঢাকাই মস্‌লিন—ঢাকাই মস্‌লিন বস্ত্রসম্বন্ধে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী টাভারনিয়ারের বিবরণ—শেঠ ও বসাকদের বাণিজ্য জন্য সুতালুটির উন্নতি—শেঠ বসাকদের গৃহদেবতা গোবিন্দজি—কোম্পানি কর্তৃক গোবিন্দপুর খাসদখলের পর শেঠদিগের বড়বাজারে গমন—বড়বাজারে তাহাদের প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দজীউর মন্দির—বৈষ্ণবচরণ শেঠ সম্বন্ধে কিম্বদন্তী—'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' প্রবাদের উৎপত্তি—বৈষ্ণবচরণের ধর্মজ্ঞান—প্রাচীন কলিকাতার অবস্থা—হ্যামিল্টনের উক্তি—শেঠ ও বসাকের বাণিজ্য—বেতোড় হাটের অধঃপতন—সুতালুটি হাটের উন্নতি—পিপ্‌লে বা পীরপল্লী—কাটগঙ্গা—কলিকাতায় পর্টুগীজ কুঠি—আলুগুদাম—আর্মানী-দের কলিকাতায় আগমন—আর্মানীদের কলিকাতায় বসবাস করাইবার জন্য জোব চার্নকের চেষ্টা। কলিকাতার ডাচ বণিকদের কুঠি—বাঁকশাল ঘাট বাঁকশাল শব্দের ব্যুৎপত্তি—কালী-ঘাটের হালদারদের গোবিন্দপুরে বসবাস—নূতন ও পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সম্মিলনে কলিকাতার জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নতি—সাইত্রিশ খ্রীষ্টাব্দের ঝড় ও ভূমিকম্প—তাহাতে প্রাচীন কলিকাতার ধ্বংস সাধন—সেই ভয়ানক ঝড়ের সমসাময়িক বৃত্তান্ত।

আমরা এ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা ও কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক বুঝিয়াছেন, কেবলমাত্র পলাশীক্ষেত্রে বিজয়-লাভ দ্বারা ভারতে ইংরাজ রাজত্বের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। তাঁহাদিগকে ইহার পূর্বে শতাধিক বৎসর ধরিয়া স্বার্থ-সংরক্ষণ জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। মুসলমান শাসনকর্তাদের হস্তে বহুবিধ অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। কারণ

মোগল তখন দেশের রাজা ও ইংরাজ-বণিক তাঁহাদের প্রজা মাত্র। তাহার উপর পর্টুগীজ, ডাচ প্রভৃতি ইউরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের প্রতিযোগিতা যে কম ছিল তাহা নহে। এই প্রতিযোগিতা সহিয়া অদম্য সাহস ও স্থিরবুদ্ধি বলে পরিণামে ইংরাজই জয়ী হইয়াছিলেন। এ জয়লাভ করিতে তাহাদের যে কত কষ্ট আপদ বিপদ সহিতে হইয়াছিল তাহা পূর্বের অধ্যায়সমূহে বিবৃত হইয়াছে।

অতীত ইতিহাস হইতে প্রমাণ হয়, মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের আমলেই ইংরাজদের কিছু বেশী কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। হিন্দুদিগের ন্যায় তাঁহারা সমান ভাবেই মুসলমান হস্তে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের প্রতিনিধিরূপে নবাব সায়েস্তা খাঁ-ই ইংরাজ-বণিকগণকে নানাবিধ কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এখন এই আসমুদ্র হিমাচলব্যাপী ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের রাজা ও ভারতের সম্রাটের শাসনাধীন ও তাঁহারই রাষ্ট্র সম্পত্তি। কিন্তু এই বিশাল সাম্রাজ্য বণিকরূপী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারিগণের প্রতিভাবলে অর্জিত। পলাশী যুদ্ধের পরে দেশের লোকে ইংরাজের শক্তি সামর্থ ও প্রভাবের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল বটে। কিন্তু তাহারা ইহার আগে জানিতে পারে নাই যে ইংরাজ জাতি শক্তি ও সাহসে, বুদ্ধি ও প্রতিভায় অতুলনীয়। পলাশী আমলের পূর্বে অনেক কর্মবীর স্বদেশভক্ত ইংরাজ ভারতে ইংরাজ রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বর্তমান কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পাঠক! আজকালকার এই গ্যাসালোক উজ্জ্বলিত বড়বাজার, হাটখোলা প্রভৃতির চিত্র চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলুন। কল্পনার সহায়তায় দেখুন, এই সকল স্থানাধিকৃত সেকালের সুতালুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের চারিদিক ভীষণ জঙ্গল-সমাচ্ছন্ন। একদিকে শিয়ালদহ, অপরদিকে হাওড়া ও দক্ষিণে চৌরঙ্গী, কালীঘাট ও ভবানীপুর, এই বিস্তৃত ভূভাগ কেবলমাত্র খাত ও পঙ্কিল বাদা ও ভূমিপূর্ণ। আর এই সমস্ত বাদায় কুম্ভীর, জঙ্গলে বাঘ এবং ডাঙ্গায় নরহন্তা, লুণ্ঠন-কারী ডাকাতের দল।

সরকারী কাগজপত্রের সহায়তা ব্যতীত সেকালের লিখিত দুষ্প্রাপ্য ও বহুযত্নে সংগৃহীত প্রাচীন পুস্তকাদি ও তদুল্লিখিত ঘটনাবলী হইতে সেই দুইশত বৎসর পূর্বের অন্ধতমসাবৃত যুগের অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

কালীঘাটের উৎপত্তি ও এতৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা ইতিপূর্বে কালীঘাট প্রসঙ্গে

বলিয়াছি। ধরিতে গেলে প্রাচীন কলিকাতা, সুতালুটি, গোবিন্দপুর, চিৎপুর প্রভৃতি লইয়াই বর্তমান কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হইয়াছে। সালিখাও একটি অতিপ্রাচীন স্থান। দুইশত বৎসরের পুরাতন পুঁথি প্রভৃতিতে ইহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, বেতোড় (বর্তমান ব্যাঁটরা) গ্রামও সেকালের একটি বিখ্যাত স্থান। বেতোড়ের 'বেতাইচণ্ডী' বহুকালের দেবতা। প্রাচীন কলিকাতার সহিত সেকালের এই সমস্ত গ্রামগুলির স্মৃতি পূর্ণরূপে বিজড়িত আছে।

কালীঘাট ও কলিকাতা—এই নামকরণ লইয়া, প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক লেখালেখি হইয়া গিয়াছে। স্বনাম-প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লেখক গৌরদাসবাবু 'কলিকতা রিভিউ'-এর পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। সে সমস্ত এস্থলে পুনরাবৃত্তি করার বিশেষ প্রয়োজন কিছুই নাই। মোটের উপর কথা হইতেছে, এই কালীঘাট বহুদিন হইতেই লোকসমাজে পরিচিত ছিল।[১]

১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে, বঙ্গেশ্বর হোসেন সাহের আমলে[২] বিপ্রদাসের 'মনসার ভাসান' রচিত হয়। এই 'মনসার ভাসান' হইতে আমরা কলিকাতা, বেতোড় ও কালীঘাট সম্বন্ধে কতক কথা জানিতে পারি। বিপ্রদাসের গ্রন্থের প্রধান নায়ক চাঁদ-সওদাগর ভাগলপুর হইতে যাত্রা করিয়া বাণিজ্যার্থে সমুদ্রগামী হইয়াছিলেন। কবি এই প্রসঙ্গে তাঁহার গন্তব্যপথের প্রধান প্রধান স্থানগুলির পরিচয় বা নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমরা রাজঘাট, ইন্দ্রঘাট, নদীয়া, আমবুয়া, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, কুমারহাটি, হুগলী, ভাটপাড়া, কাঁকনাড়া, মূলাযোড়, পাটুলিয়া, ভদ্রেশ্বর, চাঁপদানি, ইচ্ছাপুর, বাঁকিবাজার, নিমাইঘাট, চানক, রামসাল, আকনা, মাহেশ, খড়দহ, রিষড়া, সুখচর, কোন্নগর, কোতরং, কামারহাটি, এড়িয়া-দহ, ঘুসুড়ি, চিৎপুর, কলিকাতা, বেতোড়, কালীঘাট, চৌরাঘাট (চোরঘাট), জয়ঢালী, ধনস্থান, বারুইপুর, হুলিয়া, ছত্রভোগ, হাতিয়াগড় প্রভৃতি স্থানের নামোল্লেখ দেখিতে পাই।

এই সকল স্থানগুলি সেই সময়ে সাধারণে পরিচিত না থাকিলে, কবি বিপ্রদাস

১. Babu Gour Das Bysack's Kalight and Calcutta, *Calcutta Review*, April 1891. p. 306.

২. আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকাল, ১৪৯৩-১৫১৯ খ্রী.

তাঁহার গ্রন্থমধ্যে ইহার নামোল্লেখ করিতেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিপ্রদাস এই গ্রন্থ[১] রচনা করেন। তিনি যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা এবং সেই সময়ের লিখিত অন্যান্য কাহিনীও উল্লিখিত জনস্থান সমূহের মধ্যে অনেকগুলির অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছে। সেই সকল কাহিনী, পর্টুগীজ ও ইংরাজ-লেখকদিগের পুরাতন কাগজপত্র হইতেও আমরা জানিতে পারি, ইহাদের মধ্যে অনেক গ্রামের নাম ও যশ সেকালে বিশেষভাবে প্রচারিত ছিল। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা এই সময়ের একখানি ম্যাপ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।[২]

কবির কিম্বদন্তী ছাড়িয়া এখন আমরা একবার ইতিহাসের দিক হইতে এই সকল স্থানের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিব। সমসাময়িক ইউরোপীয়গণ পূর্বোক্ত জনস্থানসমূহের যেসকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন তাহার একটু আলোচনা করা যাউক।

ইউরোপীয় জাতিদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সুতালুটি অঞ্চলের নাম জাহির হইয়াছে। প্রাচীন কলিকাতার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ সাধারণের পরিচিত হইয়াছে। প্রথমত পর্টুগীজ, পরে ইংরাজ—এই দুই জাতির কার্যক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া এই সমস্ত স্থানের পরিচয় পুরাতন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ডি ব্যারোজ[৩] ও সিজার ফ্রেডরিক[৪] প্রভৃতি তৎকালীন লেখকগণ কতকগুলি প্রাচীন স্থান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত বঙ্গীয় কবিগণের বর্ণিত কাহিনী অনেক মিলিয়া যায়।[৫]

পর্টুগীজেরা যখন বঙ্গদেশে বাণিজ্যার্থে প্রবেশ করে, সেই সময়ে পূর্বে চট্টগ্রাম ও পশ্চিমে সপ্তগ্রাম এই দুইটিই প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। ইহাই সেকেলে চাটগাঁ ও সাতগাঁর বন্দর বলিয়া বিখ্যাত। তুলনায় চট্টগ্রাম বন্দর সপ্তগ্রামের

১. বিপ্রদাস পিপিলাই-এর 'মনসামঙ্গল' সম্ভবত হোসেন শাহের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

২. বিপ্রদাসের এই বর্ণনা হইতে প্রমাণ হইতেছে কলিকাতা, চিৎপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামের নামোল্লেখ থাকিলেও ইহার মধ্যে সুতালুটি ও গোবিন্দপুরের নামোলেখ নাই। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, এই গ্রামগুলি জঙ্গলাবৃত স্থান ছিল।

৩. Jao de Barros, এঁর নকসার রচনাকাল ১৫৫০ খ্রী.

৪. Caesar Fedrick, ১৫৬৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে আগমন করেন।

৫. *Proceedings of the Alsatic Society of Bengal*, 1892. p. 189 —Article on Bipradas by Mohamohopadhya Haraprasad Sastri.

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। সকল আয়তনের জাহাজই চট্টগ্রামে নঙ্গর করিতে পারিত। কিন্তু পর্টুগীজ বোম্বেটিয়াদের উৎপাতে এ স্থানের বাণিজ্য-প্রাধান্য কমিয়া আসে। চট্টগ্রামের নিম্নে বাঙ্গলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বন্দর ছিল সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের নিকটেই ত্রিবেণী সঙ্গমে তখন অনেক লোকে শুভ-পর্বদিনে ত্রিবেণীর ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে আসিত। সপ্তগ্রামের হাট-বাজার চত্বর ও গঞ্জ প্রভৃতিতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশের অনেক সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্য-প্রধান স্থান হইতে দ্রব্যাদি বিক্রয়ার্থে আসিত। তখন বেতোড় পর্টুগীজদের একটি প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। পর্টুগীজ জাহাজগুলি এই স্থানের অদূরে, বর্তমান গার্ডেনরিচে নঙ্গর করিত। বড় বড় জাহাজ নদীর শাখাসমূহ প্রবেশ করিতে পারিত না। বোট, বজরা ও ভড় প্রভৃতি এই বেতোড়ের হাট হইতে মালপত্র লইয়া সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে বরানগর, দক্ষিণেশ্বর, আগরপাড়া, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাইত। বেতোড়ে কোন নির্দিষ্ট হাট ছিল না। পর্টুগীজেরা প্রতি-বৎসর যখন এইস্থানে আসিত সেই সময়ে হাটের জন্য তাহারাই এদেশের জন-মজুর দিয়া কতকগুলি হাটচালা প্রস্তুত করাইয়া লইত। সাময়িক ক্রয়বিক্রয়ের কার্য শেষ হইয়া গেলে বড় বড় জাহাজে তাহাদের ক্রীত মালপত্রগুলি তুলিয়া লইয়া সমুদ্র-পথ দিয়া তৎকালের পর্টুগীজদের প্রধান বাণিজ্যস্থান গোয়ায় পৌছিত। পর্টুগীজেরা এই সময়ে তাহাদের হাট-বাজারের চালাগুলিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। সেই জনসংকুল হাট পরিণামে কেবল দগ্ধ বাঁশ হোগলা ও খড়ের ভস্মরাশিতে পরিণত হইয়া তাহাদের আগমন-চিহ্ন প্রকাশ করিত। আলাউদ্দিনের বাটির মত বৎসরের মধ্যে দুই একবার সহসা এই স্থান ক্ষুদ্র নগরের আকার ধারণ করিত, আবার পর্টুগীজদের প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা জনশূন্য ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইত।[১]

যাহা হউক বেতোড়ের এই বাণিজ্য জন্য চিৎপুর সালকিয়া প্রভৃতি জঙ্গলময় স্থানসমূহ ধীরে ধীরে জনপূর্ণ হইতেছিল। কুচিনান ও কলিকাতায় গঙ্গার তীরে নৌকাদি বাঁধিবার জন্য কয়েকটি ঘাট ছিল, একথাও শুনিতে পাওয়া যায়।

নিয়তির শক্তি অতিক্রম করিতে কেহই পারে না। কালের স্রোত রুদ্ধ করিতে কেহই সক্ষম নহে। লক্ষ্মীশ্রীপূর্ণ, জনসংকুল সপ্তগ্রাম, সরস্বতী মজিয়া যাওয়ায় এই নিয়তি শক্তিবশে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ১৫৬৫

১. Caesar Fredrick in Hakluyt Ed. of 1598. Vol. 1, p. 230.

খ্রীস্টাব্দেও সপ্তগ্রাম, খুব জাঁকাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু তাহার পরেই ইহার পতন আরম্ভ হয়। সপ্তগ্রামের পতন দেখিয়া তথাকার শেঠ ও বসুকেরা বেতোড়ের বাণিজ্যে লাভবান হইতে প্রয়াসী হন। কলত্রীশ গোত্রীয় যাদবেন্দ্র বসাক মহাশয় খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতার সন্নিকটবর্তী গোবিন্দপুরে বাস করিতে আসেন। এই সময়ে শেঠবংশীয় মুকুন্দরাম শেঠও[১] গোবিন্দপুর[২] গ্রামবাসী হন। ইঁহার প্রপৌত্র গোপীমোহন ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ পলাশীযুদ্ধের তিন বৎসর পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'দাদনীবণিক' ছিলেন।

যে শেঠ ও বসুকদিগের সহিত জঙ্গলময় বাদা ভূমিখণ্ড কলিকাতার বিশেষ সংস্রব, তাঁহাদের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা বহুকষ্টে তাঁহাদের সম্বন্ধে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহা এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

বসাক বা বসুকদিগের[৩] আদিবাসস্থান সপ্তগ্রাম। সপ্তগ্রামের একটি পুষ্করিণী তাঁহাদের নামানুসারে 'বসকা-দীঘি' বলিয়া বিখ্যাত। সপ্তগ্রামে বাসকালে বসাকদিগের 'বসক'[৪] উপাধি ছিল। কলিকাতায় আসিবার পর তাহা 'বসাকে' পরিবর্তিত হয়।

---

১. মুকুন্দরাম শেঠের (শ্রেষ্ঠীর) বিস্তৃত বিবরণ নগেন্দ্রনাথ শেঠ প্রণীত কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস, পৃ. ২০-২২ দ্রষ্টব্য।

২. একটি জনপ্রবাদ এই যে শেঠদিগের প্রতিষ্ঠিত তাঁহাদের কুলদেবতা গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর গ্রামের নামকরণ হয়। এই গোবিন্দপুরের জঙ্গল কাটাইয়া তদধিকৃত স্থানাংশ বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ বা গড়ের মাঠে কেল্লা নির্মিত হইয়াছে।

৩. 'বসুক' গ্রন্থ-প্রণেতা মদনমোহন হালদার মহাশয় বলেন—'বসুক' শব্দই বসাকদের প্রকৃত উপাধি এবং বসুকেরা বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত। একখানি সারগর্ভ গ্রন্থ লিখিয়া তিনি ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বসুক হইতে বসক শব্দে দাঁড়াইছে। বসক শব্দের অর্থ ধনসম্পত্তি—ভাবার্থে কর ও রাজস্ব। উহা বৈশ্যের বর্ণগত উপাধি। আমরা এই চিরপ্রচলিত বসাক শব্দই ব্যবহার করিব। তাহা না হইলে পাঠকেরা গোলে পড়িতে পারেন।

৪. কলিকাতাস্থ তন্তুবণিক জাতির ইতিহাস গ্রন্থপ্রণেতা নগেন্দ্রনাথ শেঠের মতে "আকবরের রাজত্বকালে উচ্চপদ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বুসাখ উপাধি লাভ করিতেন···বুসাখ পারসী শব্দ—বু অর্থে=সৌরভ, সাখ অর্থে=শাখা; অর্থাৎ মোগল সাম্রাজ্যের সৌরভময় শাখা। প্রাচীন বুসাখ উপাধি মধ্যযুগে বসাখ এবং বর্তমানে বসাক নামে বিদিত। পৃ. ১১৬।

এই বসাকদিগের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠী বা শেঠ বলিয়া এক সম্প্রদায় আছেন। শেঠেরাও এই সময়ে সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাস আরম্ভ করেন।

সেকালের কলিকাতা দুইখানি গ্রামে বিভক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে—

"ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয়। ডাইনে এড়াইয়া যায় হিজলির পথ।
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়॥ রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
কলিকাতা এড়াইল বেণিয়ার বালা। কালীঘাট এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতোড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা।[১] কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥
বেতাই-চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে। মহাকালীর চরণ পূজেন সওদাগর।
ধনন্তগ্রাম থানা সাধু এড়াইল বামে॥ তাহার মেলান বেয়ে যায় মাই নগর॥"

শ্রীমন্ত সওদাগর কলিকাতা উত্তীর্ণ হইয়া ধনন্তগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবির বর্ণনানুসারে এই ধনন্তগ্রাম সেকালের গোবিন্দপুর বলিয়া বোধ হয়। শ্রীমন্ত পরপারস্থ বেতাই-চণ্ডিকার পূজা করিয়া আদিগঙ্গায় প্রবেশ কালে ধনন্ত গ্রামখানি বামদিকে দেখিয়াছিলেন। 'ধনন্ত' শব্দ 'ধনস্থের' অপভ্রংশ। ধনস্থ শব্দের সঙ্গত অর্থ—যে গ্রামে ধন আছে বা ধনিগণ বাস করেন। বসাকেরা চণ্ডীকাব্য রচনার

---

১. বেতড়া বা বেতোড় আধুনিক ব্যাঁটরা। উহা হাওড়া স্টেশন হইতে এক মাইল পশ্চিমে। বেতড়ার খালকে বেতাকীর খাল বলে। উহার মোহনা আদিগঙ্গার মোহনার ঠিক সম্মুখে। পূর্বে পর্টুগীজ বণিকেরা ঐ খাল দিয়া সপ্তগ্রামে যাতায়াত করিতেন। বেতাই-চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে সেইস্থানে অতীতকালে এক মহামেলার অনুষ্ঠান হইত। ফ্রেডরিক সিজার নামক পূর্বোক্ত সমসাময়িক ভ্রমণকারী ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বাঙ্গলায় আসেন। তিনি বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে দেখিয়া গিয়াছিলন। তৎপরে মুকুন্দরামের সময়ে ঐ খাল একেবারেই বন্ধ হইয়া যায়। বেতাকীর খাল বন্ধ হইলে ইংরাজ ও পর্টুগীজ বণিকেরা হুগলী যাতায়াতকালে ভাগীরথী দিয়া যাইতেন। তখন সপ্তগ্রাম হইতে আসিবার সময় গরিফা, গোলন্দপাড়া, ইছাপুর, মাহেশ, খড়দা, কোন্নগর, চিৎপুর, শালিখা প্রভৃতি গ্রামগুলি অতিক্রম করিয়া কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সম্মুখ দিয়া আদিগঙ্গায় প্রবেশ করিতে হইত। ফ্রেডরিক লিখিয়াছেন—"Buttor a good tides rowing before you come to Satgaw from thence upwards the ships do not go because the river is very shallow. The small ships go to Satgow and there they lade.

পূর্বে সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন। তাঁহারা যে এই গ্রামের আদিম অধিবাসী তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পরই কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণের পূর্বপুরুষগণ ও কলিকাতা ঠাকুরগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ বহু পরে গোবিন্দপুরে আসিয়া বাস করেন। কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা স্থাপনের ষোল বৎসর পরে গোবিন্দপুর আসেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে প্রকাশ যে, গোবিন্দপুর ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের দক্ষিণে[১] এবং গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমা হইতে ঐ দুর্গ তিন মাইল উত্তরে। ১৬৯৬ খ্রীস্টাব্দে এই ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণ সূচনা হয়।

হ্যামিল্টন বর্ণিত কোম্পানির কুঠি ও দুর্গ সুতালুটির অন্তর্গত ছিল। খ্রীস্টীয় ১৮২০ অব্দে ইহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। খ্রীস্টীয় ১৭০০ অব্দের ২৭-এ মার্চ পর্যন্ত যে সমস্ত পত্রাদি এদেশ হইতে কোম্পানি বাহাদুরের কর্মচারীরা বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন তাহা সুতালুটি হইতে প্রেরিত বলিয়া ব্যক্ত আছে। ইহার পরের সমস্ত চিঠিপত্র যথাক্রমে কলিকাতা ও ফোর্ট উইলিয়াম হইতে প্রেরিত।[২]

এই প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের কিছু দক্ষিণে একটি নদী বা খাল ছিল। ঐ খাল বর্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ারের নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া চাঁদপাল ঘাটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে অপজনের[৩] ম্যাপেও ইহার উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন ইহার কোন অস্তিত্ব নাই।[৪] এই খাল গোবিন্দপুর

১. Yule's *Glossary* (See Chutanutty).

২. হ্যামিল্টন কলিকাতার পুরাতন কেল্লা (অর্থাৎ বর্তমান জেলারেল পোষ্টাফিস, কাস্টমহাউস ও ই. আই. রেলওয়ে এজেন্ট আফিসের অধিকৃত স্থানে যে কেল্লা ছিল যাহার অবস্থান চিহ্ন লর্ড কার্জন বাহাদুর—পিত্তলের লাইন দিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়াছেন, যাহা নবাব সিরাজউদ্দৌলা আক্রমণ করেন) তাহার কথাই বলিয়াছেন। পুরাতন দুর্গের অস্তিত্বমাত্র এখন নাই। পাঠক যেন এই পুরাতন ফোর্ট উইলিয়ামকে গড়ের মাঠের বর্তমান কেল্লা বলিয়া না ভাবেন।

৩. অপজন=Aaron Upjohn জাহাজের বাস্তুকর হিসাবে ভারতে পদার্পণ করেন ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে। তারপর ইনি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল তিনি *Calcutta Chronicle*-এর সম্পাদক ছিলেন।

৪. এই খালের বা Creek (ক্রীকের) কোন চিহ্ন না থাকিলেও ওয়েলিংটন স্কোয়ারের পার্শ্ববর্তী—'ক্রীক-রো' ইহার নাম রক্ষা করিতেছে। 'ডিঙ্গাভাঙ্গা' নামের সহিত এই খালের কোন সম্বন্ধ আছে কি না পাঠক তাহা অনুমান করিয়া

ও কলিকাতা এবং সুতালুটি গ্রামের অন্তবর্তী সীমা ছিল। যখন গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমার খাল 'গোবিন্দপুরের খাত' বলিয়া উল্লিখিত হইত তখন উত্তরের এই খালটির সম্ভবতঃ এরূপ কোন একটা নাম থাকিতে পারে। কিন্তু সে নাম যে কি ছিল তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না।

সুতালুটি সম্ভবতঃ শেঠ ও বসাকদের আগমনের পর হইতে খ্যাতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কলিকাতা গ্রামের একটা নাম ঘোষণা হইয়াছিল। চণ্ডীকাব্য হইতে পাঠক দেখিবেন অগ্রে ধনস্তগ্রাম পরে কলিকাতা, এই ভাবেই নির্দেশ আছে। কলিকাতার অধস্তনকালের আখ্যা সুতালুটি চণ্ডীকাব্যে নাই।

চণ্ডীকাব্য রচনার পর হইতে সুতালুটির ঐরূপ আখ্যা হইয়াছে। গ্লাডউইনের 'আইন-ই-আকবরীতে' 'জমা-ওয়শীল-তুমার'র মধ্যস্থ তালিকায় এই কলিকাতাই উল্লিখিত আছে। ১৫৮২ অব্দে রাজা টোডরমল সমস্ত বঙ্গদেশ জরিপ করিয়া এই তালিকা প্রস্তুত করেন। আইন-ই-আকবরী ১৫৯৬ অব্দে শেষ হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে, সুতালুটি নাম কলিকাতার পরে হইয়াছে।[১]

বস্ত্রকদিগের সুতালুটি-হাট পত্তনের ন্যূনাধিক শত বৎসর পরে, অর্থাৎ খ্রীস্টীয় ১৬৬০ অব্দে ভ্যানডেন ব্রুক (Vanden Broock)[২] নামক জনৈক ওলন্দাজ, তৎসাময়িক একখানি মানচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে (Soelanotti) বলিয়া একটি গ্রামের নামোল্লেখ আছে।[৩] সেই সময়ে কলিকাতার মধ্যে সুতার ও সেই সঙ্গে সুতার-লুটির বাণিজ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছিল।

লইবেন। হলওয়েল সাহেব গোবিন্দপুরের দক্ষিণ সীমার খালের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন —On my joining the Fleet at Fulia I did hear he was sent into Gobindapur Creek to burn and destroy the great boats there, that they might not be employed by the enemy in the attack or pursuit of the ships. – Holwell's *Indian Tracts, 1764,* p, 238.

১. Gladwin's *Ain-i-Akbari.* Vol II, p. 206.

২. প্রকৃত নাম Van den Broucke (ফান ডেন্ ব্রোক)।

৩. অনেকে অনুমান করেন, বসাকেরাই তন্তুবায়ের কাজ করিতেন, বস্ত্র ও সুতা প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু 'বসুক' নামক জাতিতত্ত্ব-বিচার গ্রন্থপ্রণেতা মদনমোহন বাবু বলেন, "বসুকেরা তন্তুবায়দিগের নিকট বস্ত্রবয়ন করাইয়া লইতেন। এই নিম্নশ্রেণীস্থ বয়ন-জীবিগণ বসুকদের নিকট কার্পাস গ্রহণ করিত এবং চরকায় সুতা কাটিবার জন্য তুলার পাঁজ প্রস্তুত করিত। এই সমস্ত তুলা

সেকালে বাঙ্গলার সূক্ষ্ম-সূত্র-শিল্প এক অপূর্ব জিনিস ছিল। 'ঢাকাই-মসলিন্' বঙ্গের অতীত গৌরবের সামগ্রী। ইউরোপের অনেক সম্রাজ্ঞী, ভারতের মোগল বাদসাহদিগের পাটরাণীগণ, বেগমগণ, এই ঢাকাই-মসলিন্ নির্মিত পোষাক পরিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিতেন। ঢাকার দশ বার ক্রোশ উত্তর পূর্বে ভুমরাও নামক একটি স্থান, অতীতকালে এইরূপ সূক্ষ্ম-সূত্র শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। এখনও সেখানে অনেক তন্তুবায়ের বাস আছে। এখনও একটি প্রবাদ আছে যে এই স্থানের সুপ্রসিদ্ধ কর্তনীরা একরতি ওজনের তুলায় একশত পঁচাত্তর হাত সূতা কাটিয়া দেন।

পাঠক! বঙ্গের এই প্রাচীন গৌরবের অস্তমিত অবস্থায় হয়ত একথা বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের বিশ্বাসের জন্য আমরা প্রসিদ্ধ ফরাসীবণিক টাভারনিয়ারের[১] উক্তি নিম্নস্থ পাদ-টীকায় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। টাভারনিয়ার যাহা লিখিয়া গিয়াছেন[২] তাহার সারমর্ম এই—বাপতাগুলি পৌণে দুই হাত চওড়া ছিল। একটি থানে কুড়ি হাত কাপড় থাকিত। এই কাপড়গুলি ৫ হইতে ১২ মামুদীতে সাধারণত বিক্রয় হইত। যদি কেহ ফরমাইস করিতেন, তাহা হইলে তদ্বারা তাহারা আরও চওড়া ও সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দিত। তাহার দাম ৫০০ মামুদি পর্যন্ত হইত। আমাদের সময়ে আমি দেখিয়াছি, এক হাজার মামুদীতে দুই থণ্ড কাপড় বিক্রয় হইয়াছে। ইংরাজ সওদাগরগণ এই বহুমূল্য কাপড়ের এক প্রস্থ কেনেন, ও দিনেমার সওদাগরগণ অপরটি লয়েন। এ কাপড়-গুলি লম্বে ২৮ হাত। মহম্মদ আলি বেগ ভারতবর্ষ হইতে পারস্যে ফিরিয়া

বস্থক বা বসাকদের নিকট গৃহীত হইত এবং চরকায় সূতা কাটিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। পরে আবার সূত্র বা বস্ত্রাকারে তাহাদিগকেই প্রদত্ত হইত। এই আদান-ক্রিয়ার অবান্তর সম্বন্ধ বশত ঐ সকল তুলার পাঁজ 'বস্থক বা বোসকে' নামে আখ্যাত। যে সকল স্ত্রীলোক কাটনা কাটিতেন তাহাদিগকে 'কর্তনী' বলিত। 'কাটনা' শব্দ কর্তনীর অপভ্রংশ। এখনও পর্যন্ত কাটনা শব্দ বঙ্গদেশ হইতে লোপ পায় নাই এবং অনেক সুদূর মফঃস্বলে কাটনা-কাটার প্রথা বৃদ্ধা বিধবাদের মধ্যে এখনও প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে একটি প্রবাদই আছে 'কাটনা কাটনা ধন।"

১. ফরাসী পর্যটক, Tr. and Ed. V. Ball (London), 1889.

২. 'The broad Baftas are $1\frac{3}{4}$ cubit wide and the piece is 20 cubits long. They are commonly sold at from 5 to 12 *Mahamudis*, but the merchant on the spot is able to have them made much wider and finer and up to the value of 500 *Mahamudis*, the piece. In my time, I have seen 2 pieces of them sold for each of which 1000 *Mahamudis* were paid. The English bought one and the Dutch the other and they were each 28 cubits. Mahamed Ali Beg while returning to Persia from his embassy to India presented *Chasufi* (II) with a cocoanut of the size of an ostrich's egg, enriched with precious stones and when it was opened a turban was drawn from it 60 cubits in length and of a *Muslin* so fine, that you would scarcely know what it was that you had in your hand. The Queen Dowager with many of the Ladies of the Court was surprised at seeing a thread so delicate which almost escaped the view—*Travels of Tavernier*, Vol II, pp. 7-8, 1679.

যাইবার সময় অষ্ট্রীচ ডিম্বাকার এক ক্ষুদ্র রত্নখচিত নারিকেল খোলের মধ্যে এক থণ্ড মসলিন্ লইয়া যান। পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় সাহ সুফীকে এক অপূর্ব জিনিস উপহার দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই রত্নখচিত নারিকেলের খোলের মুখ খুলিবামাত্রই তন্মধ্য হইতে ৬০ হাত লম্বা এক মস্‌লিনের পাগড়ি বাহির হইল। এই মস্‌লিন এত সূক্ষ্ম সূত্রে প্রস্তুত যে আদৌ তাহার অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারা যায় না। যত লম্বা মসলিন্ হউক না কেন তাহার ভার অতি কম। ভরি ও রতি ইহার মাপ-পরিমাণ। আমরা গল্প শুনিয়াছি যে ঢাকাই মসলিনের একথণ্ড যদি রাত্রিকালে কোন তৃণক্ষেত্রে রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত রাত্রি শিশিরে ভিজিয়া তাহার এরূপ অবস্থা হয় যে পরদিন প্রভাতে সূর্য উঠিলেও তাহার অস্তিত্ব বোধ হয় না। বোধ হয়, যেন ঘাসের উপর একখানি মাকড়সার সুদীর্ঘ জাল বিছান আছে।

বঙ্গের সেকালের সূক্ষ্ম-কার্পাসসূত্র বাঙ্গালীর ভাগ্যলক্ষ্মী ছিল। অনেক টাকার সূক্ষ্ম-সূত্র কার্পাসবস্ত্র ও মসলিন্ এ দেশ হইতে ইউরোপের হাটে উচ্চমূল্যে বিক্রয় হইত। কাট্‌না-কাটা এদেশে তখনকার একটা সাধারণ প্রথা। মোগলদিগের আমলে এই কাট্‌না-কাটা প্রথার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। কবিকঙ্কণের নিম্নলিখিত শ্লোকটিই তাহার প্রমাণ—

প্রভুর দোসর নাই, উপায় কে করে। 'দাদনি' দেয় এবে মহাজন সবে।
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে॥ টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে॥
দুপণ কড়ির সুতা একপণ বলে
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে।

তখন স্ত্রীলোকেরা দাদনি লইয়া কাটনা কাটিতেন। শেঠ-বসাকেরা পরবর্তী কালে দাদন দিয়া কাজ করাইতেন, পরে ইংরাজ-বণিকেরাও 'দাদনি' প্রথা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ভাগীরথীর একদিকে সুতালুটির সুতার ব্যবসা ও অপরদিকে বেতোড়ের হাট। এই দুইটি হাটের বাণিজ্যের জন্যই ভবিষ্যৎ কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিশেষ সহায়তা হইয়াছিল। ধরিতে গেলে শেঠ-বসাকদিগের আগমনে বন-জঙ্গলপূর্ণ গোবিন্দপুর একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়।

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বল্লভাচার্যই রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির উপাসনা ভারতে প্রচার করেন, এরূপ একটা জনপ্রবাদ আছে। বলিতে পারি না, শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির বহুল প্রচার ইহার পূর্বে হইয়াছিল কি না। বসাকেরা গোবিন্দপুরে আসিবার পর রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবত ইহা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কাল। শেঠ-বসাকদিগের গোবিন্দজী ঠাকুর শ্রীরাধাকৃষ্ণেরই যুগল মূর্তি।[১] ক্রমশ গোষ্টি-বৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতির সহিত এই শেঠ ও বসাক বংশীয়দের অনেকের গৃহে শ্যামরায়, মদনমোহন ইত্যাদি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হয়।

১. এই মূর্তি স্থাপনায় প্রধান উদ্যোগী মুকুন্দরাম বসাক। মুকুন্দরামের উপাধি 'শেঠ' ও তিনি মোদ্গল্য-গোত্রীয়। ১৭৫৭ খ্রী. অব্দে অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের আমলে কোম্পানি বাহাদুর গোবিন্দপুর হইতে লোকের বসবাস উঠাইয়া দিলে তদ্বংশজাত বৈষ্ণবচরণ তথা হইতে গোবিন্দজীকে উঠাইয়া আনিয়া বড়বাজারে নিজ বসতবাটির উত্তরে স্থাপিত করেন। তদবধি গোবিন্দজী এখনও তথায় বর্তমান আছেন। টাঁকশালের দক্ষিণ পূর্বে বড়বাজারে যাইবার পূর্বধারে তাঁহার মন্দির আজও অবস্থিত। (বসুক-১২৫৬) মুকুন্দরামের বংশধর বৈষ্ণবচরণ শেঠ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা প্রচুর ধন সঞ্চয় করেন। তাঁহার মত ধর্মভীরু লোক সেকালে বড় কম ছিল। তেলিঙ্গানা প্রদেশের রাম-রাজার পূজার জন্য গঙ্গাজল তিনি কলিকাতা হইতে শীলমোহর করিয়া পাঠাইতেন। বৈষ্ণবচরণের ধর্মভীরুতার সম্বন্ধে একটি গল্প শুনিয়াছি। পাঠক বোধ হয় শুনিয়াছেন এদেশে একটি প্রবাদ বাক্য আছে 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন'।

ধরিতে গেলে এই শেঠ ও বসাকগণ কলিকাতার 'জঙ্গল-কাটা' বাসিন্দা। তাঁহারা যদি ষোড়শ শতাব্দীতে সপ্তগ্রাম হইতে সুতালুটিতে আসিয়া বাস না

এই গৌরী সেন ব্যবসায় সূত্রে বৈষ্ণবচরণের অংশীদার ছিলেন। বৈষ্ণব শেঠ এক সময়ে কতকগুলি দস্তা খরিদ করেন। কিন্তু পরীক্ষায় জানা যায় এই দস্তার মধ্যে রূপার অংশ কিছু বেশী। বৈষ্ণবচরণ ভাবিলেন গৌরী সেনের নামে দস্তা কেনায় তাহা 'রাঙ্গের বদলে রূপায়' দাঁড়াইয়াছে। ধর্মভীরু কর্তব্যপরায়ণ বৈষ্ণবচরণ ইহার বিক্রয়লব্ধ সমস্ত টাকাই গৌরী সেনকে প্রদান করেন। এই ব্যাপারে গৌরী সেন মহা ধনী হইয়া উঠেন। গৌরী সেন তাঁহার অর্জিত বিপুল সম্পত্তি দান-খয়রাতে ব্যয় করিতেন। কন্যাদায়, মাতৃদায়, পিতৃদায়, দেনার দায়ে কয়েদী অধমর্ণ, কিম্বা যাহারা ন্যায়পথে থাকিয়া সৎকার্যের জন্য ফৌজদারিতে জড়িত ও জরিমানার আসামী তাহাদের জন্যই অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। ইহা হইতেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' এই প্রবাদ-বাক্যের উৎপত্তি। এক্ষণে এই বৈষ্ণবচরণ শেঠ সম্বন্ধে দুই একটি কিম্বদন্তী বলিব। বৈষ্ণবচরণ এক সময়ে বর্ধমানের কোন মহাজনের নিকট দশহাজার টাকার চিনি কিনিবার সংকল্প করেন। এই লোকটির নাম গোবর্ধন রক্ষিত, জাত্যংশে তাম্বুলী। সমস্ত মাল যখন বড়বাজার কদমতলা ঘাটে পৌছিল সেই সময়ে বৈষ্ণবচরণের কর্মচারীরা মাল নামাইতে যান। তাঁহারা গোবর্ধনের নিকট কিছু উপরি পাওনার লাভে হতাশ হইয়া মনিব বৈষ্ণবচরণকে মিথ্যা করিয়া জানান যে মাল তত সুবিধার নয়, ইহা কিনিলে লোকসান হইবে। বৈষ্ণবচরণ রক্ষিত মহাশয়কে অন্যলোক দ্বারা সেই কথা জানাইয়া বলেন, "আপনার মাল শুনিতেছি তত ভাল নয়, এজন্য দাম কমাইতে হইবে।" সেকালের লোক ধর্মকে বড় ভয় করিতেন। কাজেই রক্ষিত মহাশয় যখন এই মিথ্যাপবাদ শুনিলেন, তখন তিনি ব্যবসায়ে বদনামের ভয়ে তাঁহার চাকরদের আদেশ করিলেন, "চিনির নৌকা গঙ্গায় ডুবাইয়া দে। বদনাম কিনিয়া চিনি বেচিতে চাহি না।" তাঁহার চাকরেরা এই হুকুম পাইয়া যখন তাহা কতকটা কার্যে পরিণত করিয়াছে তখন এ সমস্ত কথা ধার্মিকপ্রবর বৈষ্ণবচরণের কাণে পৌছিল। তিনি তখনই আসিয়া মহাজন রক্ষিত মহাশয়কে বলিলেন, "আমার কর্মচারীদের মুখে মিথ্যা সংবাদ শুনিয়া আমি আপনাকে সন্দেহ করিয়াছি। গঙ্গায় যে মাল ফেলিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে ক্ষতি-গ্রস্ত করিব না। এখন যে মাল মজুত আছে তাহার দাম পূর্ব স্বত্ব মতেই দিব।" কিন্তু ধর্মজ্ঞানে গোবর্ধনও বৈষ্ণবচরণের অপেক্ষা কোন বিষয়ে ন্যূন ছিলেন না। তিনি কোনমতেই পুরা দামে মাল বেচিতে চাহিলেন না। যে মাল নষ্ট হইয়া-ছিল তাহা বাদে তিনি বৈষ্ণবচরণের নিকট মালের দাম চুকাইয়া লইলেন। হায় বাঙ্গলা! হায় বঙ্গবাসী! তোমরা দেড়শত বৎসর পূর্বে যেরূপ মহত্বে ভূষিত ছিলে আর কি সে দিন ফিরিয়া আসিবে!

করিতেন, তাহা হইলে এই কলিকাতাকে আজ আমরা প্রাসাদময়ী নগরী রূপে দেখিতে পাইতাম না।

প্রাচীন কলিকাতায় যে হাট পত্তন হইয়াছিল, তাহা চণ্ডীকাব্যের বর্ণনা হইতে জানা যায়—

ধালিপাড়া মহাস্থান কলিকাতা, কুচিনান
দুই কূলে বসাইয়া বাট।
পাষাণে রচিত ঘাট দুকূলে যাত্রীর নাট
কিঙ্করে বসায় নানা হাট॥

প্রাচীন কলিকাতায় বসুকেরাই প্রথমে একটি হাট-স্থাপনা করেন। চণ্ডীকাব্যের বর্ণনা হইতে দেখা যায়, কলিকাতার তখনকার হাটসমূহ হইতে হয়ত ভবিষ্যতে 'সুতালুটি হাটখোলা' বা 'সুতালুটি হাটতলা' দাঁড়াইয়াছে। তখনকার হাটসমূহ পাকা পোক্তা ধরনের ছিল না। হয়ত উন্মুক্ত-স্থানেই অনেক হাট বসিত এই জন্য হয়ত 'খোলা হাট' এই আখ্যা হইতে ক্রমশ তাহা 'হাটখোলায়' দাঁড়াইয়াছে।

বেতাকীর খালের দুর্দশার সহিত বেতোড়ের হাট ক্রমশ শ্রীহীন হইতে থাকে। পর্টুগীজ বণিকেরাও তথায় যাতায়াত বন্ধ করিয়া দেন। বেতোড়ের হাটের ধ্বংস হইলে কলিকাতার হাটের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। জোব চার্নক যে সময়ে সুতালুটিতে তৃতীয়বার পদার্পণ করিয়া কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন সে সময়ে সুতালুটির হাট বেশ জোরে চলিতেছিল। কারণ জোব চার্নক নিজেই লিখিয়াছেন, "চারিদল শেঠ ও বসাকেরা সপ্তগ্রামের অধঃপতনের সূচনা দেখিয়া গোবিন্দপুরে বসবাস করেন। তাঁহারা প্রথমে বেতোড়ের বাণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। বেতোড়ের অধঃপতনের পর সুতালুটির হাট প্রতিষ্ঠিত হয়।"[১]

জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠার প্রায় সাতাশ বৎসর পরে এই প্রাচীন

১. The foreign market attracted native traders and merchants to the spot and in particular from families of Bysacks and one of Setts, leaving the then rapidly declining city of Satgong, came and founded the Settlement of Govindpur and established Suttnutai market on the north side of Calcutta—Wilson, *Early Annals*, Vol I, p. 128.

কলিকাতার যে সামান্য উন্নতি হইয়াছিল, তাহা সমসাময়িক হ্যামিল্টনের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

বঙ্গক নামক গ্রন্থ রচয়িতা বলেন, "সম্ভবত খ্রীস্টের ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বসাকেরা কলিকাতায় আসিয়া প্রথম বসবাস করেন। বসাকেরা পর্টুগীজ ও ইংরাজ উভয় জাতীয় বণিকদের সহিত ব্যবসায়সূত্রে লিপ্ত ছিলেন। বেতোড়ের হাটের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে এপারে সুতালুটির হাট জাঁকিয়া উঠে। বঙ্গকেরা ধরিতে গেলে কলিকাতার 'জঙ্গল কাটানো' অধিবাসী। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে বংশবৃদ্ধির সহিত তাঁহারা প্রাচীন কলিকাতায় বিস্তারিত হইয়া পড়েন।" এ সম্বন্ধে সমসাময়িক হ্যামিল্টন সাহেব যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ এই—"১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতার অবস্থা অন্যরূপ ছিল। বর্তমান নগরী সেই সময়ে নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কয়েকখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। দশ বারখানি ঘর লইয়া, এক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা অনেকেই কৃষকশ্রেণীভুক্ত। চাঁপাল ঘাটের (চাঁদপাল) দক্ষিণে এক বনভূমি। ক্রমে এই বন পরিষ্কৃত হয়। খিদিরপুর ও এই বনভূমির মধ্যে দুইখানি গ্রাম ছিল। এই সময়ে শেঠ ও বসাকেরা এখানকার প্রধান ব্যবসায়ী। তাহাদের যত্নেই এসব গ্রামে লোকের বসবাস হয় ও ইহা একটি ক্ষুদ্র নগরীতে পরিণত হয়। বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম (গড়ের মাঠের পার্শ্ববর্তী স্থান) ও এসপ্লানেড (ধর্মতলার নিকটবর্তী স্থান) অধিকৃত ভূভাগেই উল্লিখিত বনভূমি ও দুইখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে চৌরঙ্গীর জঙ্গলের মধ্যে দুই একখানা গ্রামের অস্তিত্ব দেখা যায়। এই সকল ক্ষুদ্র গ্রামের চারিদিকে নালা নর্দমা ও খাল। ধরিতে গেলে এই সময়ে চিৎপুর হইতেই কলিকাতার সীমা আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু চিৎপুর ও কলিকাতার মধ্যবর্তী ভূভাগ বন-জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে বর্গীর হাঙ্গামার জন্য কলিকাতার একদিক ব্যাপিয়া খাল খনন করা হয়। ইহা 'মারহাট্টা ডিচ' বা 'বর্গীর খাত' বলিয়া বিখ্যাত। সিরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন, সেই সময়ে সহরের মধ্যে ইংরাজদের ৭০ খানি বাড়ি ছিল। এখন যাহা এসপ্লানেড, চৌরঙ্গী ও ফোর্ট উইলিয়াম, ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দেও তাহা জঙ্গলময় ছিল। এই জঙ্গলসমূহের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম ও মধ্যে মধ্যে গোচারণ ভূমি।"[১]

১. A forest to the south of (Champal Ghat) which was afterwards removed by degrees between Kidderpur and the forest were

বহুক গ্রন্থকার বলেন, "প্রাচীন কলিকাতায় তাঁহাদের (শেঠ বসাকদের) একটি হাট সংস্থাপিত হয়। চণ্ডীকাব্যে যে কলিকাতা-হাটের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, উহা তাঁহাদেরই সেই বিচার্যমান হাট এবং অধস্তনকালে ইহা 'সুতালুটি হাটখোলা' বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। বেতাকীর খালে চড়া পড়িতে আরম্ভ হইলে, বেতোড়ের হাটের অবনতি ঘটে ও বণিকেরা ক্রমে ঐ হাটে যাতায়াত কমাইয়া ফেলেন। বেতোড়ের হাট জনশূন্য হইলে কলিকাতার হাট জনাকীর্ণ হইয়া উঠে। পর্টুগীজ বাণিজ্যের জন্যই বেতোড়ের হাটের উন্নতি। শেঠ বসাকেরা পর্টুগীজ ওলন্দাজ ডাচ্ প্রভৃতি সর্বজাতীয় বণিকদের সহিত ব্যবসা করিতেন কিন্তু ইংরাজদের সহিত তাঁহাদের কিছু বেশী বনিবনাও হইত। পর্টুগীজদিগকে লোকে 'ফিরিঙ্গি'[১] আখ্যা দিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে একদল সমুদ্রপথে বোম্বেটিয়াগিরি করিত, অপর দল হুগলী সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য করিত। পর্টুগীজ বোম্বেটিয়ারা, গ্রাম নগর লুঠ করিত, ছেলেমেয়ে চুরি করিত, অর্থের জন্য লোকের জীবন নাশ করিত—মোগল সম্রাটের প্রজাগণের উপর অত্যাচার করিত—সুন্দরী

2 villages whose inhabitants were invited to settle in Calcutta by the ancient family of Sets, who were at that time merchants of great note and very instrumental in bringing Calcutta into the form of a town. Fort William and Esplanade are the sites where this forest and the two villages above named stood. In 1717 there was a struggling village consisting of small houses surrounded by puddles of water where now stands the elegant houses of Chowringhee...Calcutta may at this period was extending to Chitpur Bridge but the intervening space consisted of ground covered with jungle....What are now called the Esplanade the site of Fort William and Chowringhee were so late as 1756 a complete tract of jungle interspersed with small pieces of grazing land.—Hamilton, E. I., *Gazetteer, 1818*, London, Vol II. p. 316.

১. Applied by natives in India (espcially in the South), specifically to the Indian-born Portuguese, or when used more generally for 'European' implies something of hostility or dispargement—*Hobson-Jobson*, p. 352.

রমণীলুঠ করিয়া লইয়া দেশে বিদেশে বিক্রয় করিত। বাঙ্গলার মোগল শাসনকর্তারা বহু চেষ্টা করিয়াও ইহাদের সম্পূর্ণরূপে দমন করিতে পারেন নাই। শেষ সম্রাট সাহজাহানের চেষ্টায় পর্টুগীজগণ সম্যকরূপে বিধ্বস্ত হয়। সম্রাট হুগলী হইতে তাহাদের বাসোচ্ছেদ করেন, এবং পর্টুগীজদের এই অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে।[১]

সমুদ্রতীরে "পিপলে" বলিয়া একটি বন্দরে পর্টুগীজদের বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। পিপলে বন্দরে, কেবল পর্টুগীজ নহে, ইংরাজ ও দিনেমার বণিকগণও[২] বাণিজ্য করিতেন। ইহা ইংরাজীতে 'পিপলি' ও বাঙ্গলায় পীরপল্লী বলিয়া আখ্যাত হইত। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় পিপলি সমুদ্রতীরস্থ একটি প্রধান বন্দর ছিল। চণ্ডীকাব্যে লিখিত আছে—

দক্ষিণে মেদিনীমল্ল বামে বীর থানা। কাণহাটা ধুলিগ্রাম পশ্চাৎ করিয়া।
কেরয়ালের ঝমঝমি নদী যুড়ে ফেনা॥ অঙ্গরপুরের ঘাট বামেতে থুইয়া॥
ফিরিঙ্গির দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রি দিন বয়ে যায় হারামদের[৩] ডরে॥

১. The characters, however, of foreign traders must have seriously hampered the whole commerce of the place, for the Portuguese were at the best dangerous people to deal with and there was not so difference between the merchants of Hoogly and the pirates of Chittagong. The "Portuguese in Bengal", says Van Lins Chuten, writing in 1595 "live like wild man and untamed horses. Every man doth there what he wills and every man is lord and master. They pay no regard to justice and in this way certain Portuguese dwell among them, some here, some there, and are for the most wickedness by them committed—*Hakluyt Society's Edition* of 1885. Vol I, p. 95. Wilson.—সম্রাট সাহজাহান এই পর্টুগীজদের উচ্ছেদকালে আদেশ দিয়াছিলেন "ইহাদের আশ্রয়স্থান ধ্বংস করিবে ও সমস্ত পর্টুগীজদিগকে ক্রীতদাসরূপে বন্দী করিয়া আগরায় পাঠাইবে।—Bernier, Vol I, p. 236.

২. পর্টুগীজ, ইংরাজ ও দিনেমার ছাড়া এখানে ওলন্দাজরাও বাণিজ্য করিত।

৩. এই 'হারামদের ডরে' বোধ হয় পর্টুগীজ জলদস্যুদের লক্ষ্য করিয়া লিখিত।

সিংহল যাত্রাকালে ধনপতি সওদাগর মেদিনীপুর অতিক্রম করিয়া 'ফিরিঙ্গির দেশখানা' দর্শন করিয়াছিলেন। তখন ভাগীরথী অবলম্বনে পিপলিতে যাতায়াত চলিত। কাপ্তেন আলেকজান্দার হ্যামিল্টনও[১] বলেন—"পিপলে সহর গঙ্গানদীর এক শাখার ধারে অবস্থিত ছিল। উহা বালেশ্বর হইতে ১৫ মাইল অন্তর।[২] বালেশ্বরে যে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যাইত, পিপলে সহরেও তাহা পাওয়া যাইত। এজন্য দিনেমার পর্টুগীজ ও ইংরাজ-বণিকগণ এখানে বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিয়া এ বন্দরের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন।

ইংরাজদিগের মত ওলন্দাজ, ফরাসী ও দিনেমারেরাও শেঠ ও বসাকদিগের সহিত বাণিজ্যকার্যে লিপ্ত ছিলেন।[৩] ওলন্দাজ বা ডাচদিগের আগমনে পর্টুগীজদের বাণিজ্য অনেকটা কম জোর হইয়া পড়ে। ওলন্দাজেরা খিদিরপুর হইতে

১. কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিল্টন ১৬৮৮-১৭১৭ সালের মধ্যে অনেকবার ভারত এবং প্রাচ্যদেশ ভ্রমণ করেন। ইনি 'আঠার শতকের সিন্দবাদ' নামে পরিচিত ছিলেন। এর রচিত গ্রন্থের নাম *New Account of the East Indies*.

২. Piply lies on the banks of river supposed to be a branch of the Ganges, about 5 leagues from that of Ballasore. Formerly it was a place of trade and was honoured with English and Dutch Factories. The country produces the same commodities that Ballasore does. At present it is reduced to beggary by the factory's removal to Hoogly and Calcutta, the merchants being all gone. পিপ্‌লিবন্দর হইতে পর্টুগীজদের উচ্ছেদ হইবার পরও তাহারা পুনরায় সম্রাটের অনুগ্রহভাজন হয়, এবং সম্রাট তাহাদিগকে ব্যাণ্ডেল ও তৎসন্নিহিত স্থানে বসবাস জন্য জমি প্রদান করেন। ব্যাণ্ডেল গির্জায় একটি প্রস্তরফলকে ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দ খোদিত আছে। হুগলীর প্রাচীন নাম 'গোলিন' বা 'উগোলিন' ও তাহা হইতে হুগলী শব্দের উৎপত্তি। গোলিন পর্টুগীজ শব্দ ইহার অর্থ গোলাবাড়ি।

৩. আমরা ইতিপূর্বে দুই একস্থলে বসাকের পরিবর্তে 'বস্থক' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি। বস্থক-গ্রন্থ প্রণেতার মতে 'বস্থক'ই ঠিক শব্দ। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেকর্ডে বস্থক শব্দ Bysack বলিয়া লিখিত হইয়া আসিয়াছে এবং তাহা হইতেই 'বসাকে' দাঁড়াইয়াছে। বসাক শব্দটি সাধারণ প্রচলিত শব্দ বলিয়া আমরা ইহাই অতঃপর ব্যবহার করিব।

শাঁকরালের খাল পর্যন্ত ভাগীরথীর অংশকে গভীর করিয়া দেন। ঐ জন্য ঐ অংশকে 'কাটি-গঙ্গা' বলে।

জোব চার্নক কর্তৃক সুতালুটিতে কুঠি স্থাপিত হইবার পর পর্টুগীজ ও আর্মানীরা আসিয়া সুতালুটিতে ব্যবসা আরম্ভ করেন। যে স্থান এখন 'আলুগুদাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই স্থানেই পর্টুগীজদের বাণিজ্যাগার ছিল। আলুগুদাম, (Algodam) 'অলগোডাম' নামক শব্দের অপভ্রংশমাত্র। পর্টুগীজ ভাষায় 'অলগোডাম' শব্দের অর্থ তুলা। সুতালুটিতে তখন কার্পাস-বাণিজ্যের বড়ই প্রাদুর্ভাব, এইজন্য বোধ হয় পর্টুগীজেরা তাহাদের কলিকাতার বাণিজ্য-কুঠির অধিকৃত স্থানকে 'অলগোডাম' বলিত, ক্রমে তাহা 'আলুগুদামে দাঁড়াইয়াছে।

আর্মানীগণের সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলা এস্থলে প্রয়োজন। কারণ আর্মানীগণ বহুদিন হইতেই এদেশে বাণিজ্য করিত। ইংরাজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিদের বঙ্গদেশে প্রবেশের বহুপূর্বে তাহারা বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল। আর্মানীয়ানেরা ইউরোপীয় জাতিদিগের ন্যায় জলপথে ভারতে আসে নাই। বহুকাল পূর্বে পারস্যোপসাগরের উপকূলস্থ স্থানসমূহ হইতে তাহারা খোরাসানে বাণিজ্য করিতে আসিত। তৎপরে কান্দাহার ও কাবুলের পথ ধরিয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে দিল্লী, বেনারস, পাটনা ও বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। আড়াই শত বৎসর পূর্বে তাহারা কাশিমবাজারের সান্নিধ্যে সৈদাবাদে একটি বাণিজ্যাগার স্থাপন করে। ১৬২৫ খ্রীস্টাব্দে দিনেমারেরা চুঁচুড়ায় আসে।[১] জোব চার্নকের আমলের বহুপূর্ব হইতেই কলিকাতায় ও চুঁচুড়ায় আর্মানীদের বসবাস হইয়াছিল। কারণ বর্তমান আর্মানী

১. আর্মানীগণ সেই সময়ে দেশের নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৬৫২ খ্রীস্টাব্দে আকবরের রাজত্ব সময়ে তাঁহারা আগরায় এক গির্জা নির্মাণ করেন। আগরায় এই গির্জার একটি প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় বাদসাহী আমলে ইহাদের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। কলিকাতার আর্মানী-গির্জায় যে প্রস্তরফলকের কথা উপরে বলিয়াছি তাহা আর্মানী ভাষায় লিখিত। তাহার ইংরাজী অনুবাদ এই—Rezabeebeh the wife of the late charitable Sookeas departed this world to life eternal on the 2lst Day of Nakha in the year 15 of the new era of Julpha which corresponds with the 11th of July 1630 A.D. এই রেজা বিবি ও তাঁহার স্বামী সুকিয়া, সেকালের কলিকাতায় দয়ালু ও দানশীল বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই সুকিয়ার নাম হইতেই বর্তমান 'সুকিয়াস্ স্ট্রীট' নামকরণ হইয়াছে।

গির্জার মধ্যে যে সমাধি ক্ষেত্রটি আছে তাহার একটি সমাধির উপর '১৬৩০—১১ই জুলাই' এই কয়েকটি শব্দ খোদিত আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, জোব চার্নকের আগমনের বহু পূর্বে কলিকাতায় আর্মানীদের বাস বিস্তার হইয়াছিল।[১]

পরবর্তীকালে আর্মানীদিগকে কলিকাতায় আনাইবার প্রধান উদ্যোগী জোব চার্নক। তাহার পূর্বে এখানে আর্মানী সংখ্যা অতি কম ছিল। জোব চার্নকের অনুরোধে, অনেক আর্মানী চুঁচুড়া হইতে বাস উঠাইয়া কলিকাতায় আসেন। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে ইংরাজ কোম্পানি আর্মানীদের ব্যবহারের জন্য একটি কাষ্ঠনির্মিত গির্জা নির্মাণ করিয়া দেন। এই ঘটনা হইতে প্রমাণ হয়, জোব চার্নকই আর্মানীদিগকে নানাবিধ সুবিধাকর বন্দোবস্তে কলিকাতায় আনয়ন করেন। আর্মানীদিগের সহিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দের ২২ জুন তারিখে যে সন্ধিপত্র হয়, তাহা হইতে প্রমাণ হয় যে ইংরাজ কোম্পানি আর্মানীদিগকে বিনামূল্যে গির্জা নির্মাণের জমি পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলেন।[২] ইহার কারণ আর কিছুই নহে, নানা কারণে ইংরাজেরা আর্মানীদিগের উপর অনুরক্ত ছিলেন। আর্মানীরা বহুদিন ধরিয়া এ দেশে বাস করিয়া আসিতেছেন। এ দেশের ভাষা সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিজ্ঞতা

১. এ বিষয়ে মতান্তর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা রাধারমণ মিত্রের কলিকাতা দর্পণ, পৃ. ৯-১৩ দ্রষ্টব্য।

২. Whenever 40 or more of the Armenian nation, shall become inhabitants of any garrison, cities or towns, belonging to the Company in the East Indies the said Armenians shall not only enjoy the free use and exercise of their religion, but there shall be allotted to them a parcel of ground to erect a church thereon for worship and service of God in their own way. And that we also will on our own charge cause a convenient church to be built of timber which afterwards the said Armenians may alter and build with stone or other solid materials to their own liking. And the said Governor and Company will allow fifty pounds per annum during the space of seven years, for the maintenance of such priest and minister as they will choose to officiate therein (Given under the Company's Larger Seal, June 22nd 1688) *Bengal and Agra Gazetteer*, 1841, Vol I, Cal.

বেশী। অনেক আর্মানী অতি উত্তমরূপে উর্দু ও পার্শী শিক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য ইংরাজের দ্বিভাষীরূপে অনেক সময়ে আর্মানীয়ানদের প্রয়োজন হইয়াছিল। কারণ ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে আমরা দেখিতে পাই, খোজা সরহদ বলিয়া একজন আর্মানী দ্বিভাষী রূপে ইংরাজপক্ষের সহিত সম্রাট ফেরোকসিয়ারের দরবারে গমন করিয়াছিলেন। চল্লিশ বৎসর পরে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে সময়ে কলিকাতা আক্রমণ করেন তৎকালে খোজা পিট্রস্ আরাটুন নামক একজন আর্মানীয়ান ইংরাজ গবর্ণর ড্রেকের দ্বিভাষীরূপে নবাবের প্রতিনিধি উমিচাঁদের সহিত সন্ধি সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন।

আজও কলিকাতায় 'ব্যাঙ্কশাল' বা বাঁকশাল বলিয়া একটি রাস্তার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই 'বাঁকশালে' ওলন্দাজ বা ডাচ-বণিকদের কলিকাতার কুঠি ছিল। এখন যে স্থানকে 'বাঁকশাল-ঘাট' বলে, অনেকে অনুমান করেন, সেই স্থানেই তাহাদের বাণিজ্য কুঠির অবস্থান স্থান। বাঙ্কশাল শব্দ ওলন্দাজী 'বঙ্কশাল' শব্দের অপভ্রংশ। 'বঙ্ক' শব্দের অর্থ নদীর তীরবর্তী কুঠি, 'শল' অর্থে কর বা টেক্স।[১] ওলন্দাজ ভাষার অর্থমত, নদীতীরে যে স্থানে মাশুল আদায় হয় তাহাকে 'ব্যাঙ্কশাল' বলে। পূর্বেই বলিয়াছি, ওলন্দাজেরা মোগল সরকারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া ভাগীরথীর কিয়দংশ কাটাইয়া প্রশস্ত করিয়া দেন। যে সকল

১. মার্শম্যান সাহেবের মতে ইহা একটি পর্টুগীজ শব্দ। রেভারেণ্ড লং সাহেব বলেন, Bank Hall—a hall on the bank of the river। রেইনী সাহেব ইহার অন্যবিধ অর্থ করেন। তিনি বলেন ইহা একটি মিশ্রশব্দ। ইহা ইংরাজী Bank (নদীতীর) ও সংস্কৃত 'শালা' বা গৃহ এই অর্থে ব্যবহৃত হইত। অথবা এই স্থানে নদীর বাঁক ছিল বলিয়া ইহা 'বাঁক' এই বাঙ্গলা শব্দ ও 'শালা' এই সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। যিনি যে ভাবে এই বাঁকশাল শব্দের অর্থ করুন না কেন, ইহা যে ডাচ ভাষাভুক্ত তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের কাগজপত্রে দেখা যায় বিলাতের কর্তারা কেজিরিতে (Kedigree) একটি 'Bank's-hall' (Marine Yard) স্থাপনের আদেশ করিতেছেন। সুপ্রসিদ্ধ টল্‌বয়েজ হুইলার সাহেব বলেন—"The term 'Banksall' has always been a puzzle to the English in India. It is borrowed from the Dutch or Danish 'Zoll', the English 'Toll'. The 'Bankshall' was thus the place on the 'bank' where all tolls or duties were levied on landing goods—T. Wheeler, *Early Records of British India*. p. 196, F.N.

নৌকা জাহাজ বা ভড় এই 'কাটী-গঙ্গার' উপর দিয়া যাইত, এই 'ব্যাঙ্কশালে' বা নদীতীরবর্তী কুতঘাটায় তাহাদের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা হইত। এই বাঁকশাল বা কুতঘাটার মালিক ছিলেন হলাণ্ডার্স বা ওলন্দাজগণ। তাঁহারা ভাগীরথী নদীর উভয় দিকে থাকিয়া, অন্য জাতীয় বণিকদের নিকট কর আদায় করিতেন। ইহা দ্বারা আরও প্রতীয়মান হইতেছে, নিশ্চয়ই তৎকালীন মোগল শাসনকর্তার অনুমতি মতে বা তাঁহাদের প্রদত্ত কোন সনন্দের সহায়তায় তাঁহারা এরূপ নদী-কর আদায় করিতেন অথবা এই কর আদায়ের চুক্তি অনুসারেই তাঁহারা 'কাটী-গঙ্গা' কাটাইয়া দেন।

শেঠ বসাক, দিনেমার, আর্মানী, ইংরাজ, পর্টুগীজ ও ডাচ্ ব্যতীত এই সময়ে কলিকাতা গোবিন্দপুর ও সুতালুটির জঙ্গল কাটাইয়া আরও অনেকে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে কালীঘাটের হালদার মহাশয়গণের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ষোড়শ শতাব্দীতে ভবানীদাস কালীর সেবায়েত ভুবনেশ্বর চক্রবর্তীর কন্যাকে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করেন। যাদবেন্দ্র ভবানীদাসের প্রথম পক্ষের সন্তান। ভুবনেশ্বরের কন্যার গর্ভে রাঘবেন্দ্র বলিয়া আর এক সন্তান জন্মে। রাঘবেন্দ্র ভুবনেশ্বরের মৃত্যুর পর কালীর সেবায়েত নিযুক্ত হন। তাঁহার বংশধরদের অনেকে গোবিন্দপুরে উঠিয়া আসেন। ভবিষ্যতে যখন এই গোবিন্দপুরে বর্তমান ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের জন্য অধিবাসীদের উঠাইয়া দেওয়া হয় সেই সময়ে যাদবেন্দ্রের অধস্তন পুরুষেরা কালীঘাটে চলিয়া যান।

ইহার পর যখন পুরাতন ও নূতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিদ্বয়[১] একত্রে মিলিত হইয়া যায় (১৭০৬ খ্রীঃ) সেই সময়ে নূতন কোম্পানির দল হুগলী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। উভয় কোম্পানির সমীকরণের পর কলিকাতার উন্নতি ক্রমশঃ হইতে থাকে। এই সময়ে অনেক লোক কলিকাতায় আসিয়া পাকা বসতবাটি নির্মাণ করেন। এই সময়ে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থানসমূহে দশ বার হাজার লোকের বসবাস ছিল।[২] এতজ্জন্য কোম্পানি বাহাদুরের কিছু আয় বৃদ্ধি হয়।

১. পুরাতন এবং নূতন কোম্পানি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পায় ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে। এই দুটি একীভূত বণিকসঙ্ঘের নামকরণ হয় United Company of Merchants of England Trading to the East Indies.

২. It may contain in all about 10 to 12000 souls and the Company's revenue are pretty good and well paid. They rise from ground rent and consulage on all goods imported by British subjects but all the nations besides are free from taxes.—Hamilton's *East India Gazetteer*, Vol II, p. 18.

১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত, কলিকাতার নানাবিষয়ে ক্রমোন্নতি হইতেছিল। নানাস্থানে বাড়ি, ঘর, দীর্ঘিকা, বাগান প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। সেই জঙ্গলময় সুতালুটিতে গঙ্গাতীর হইতে দেখিলে, যেন একটি ক্ষুদ্র জনস্থান বলিয়া প্রতীয়মান হইত। কিন্তু ১৭৩৭ সালের বিখ্যাত ঝড়ে এই নবপ্রতিষ্ঠিত, উন্নতিমুখ-প্রধাবিত, ক্ষুদ্র নগরীর ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল। এরূপ ভয়ানক ঝড় বঙ্গদেশে আর কখনও হইয়াছিল কিনা, বোধ হয় না। একশত ছিয়াত্তর বৎসর পূর্বে[১] প্রাচীন কলিকাতায় যে মহাঝড় হয়, তাহার নিকট বিবরণ আমরা বহুকষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি। পাঠকবর্গের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

এই সময়ে স্যার ফ্রান্সিস রাসেল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠির মন্ত্রণাসভার সদস্য ছিলেন। রাসেলের বর্ণিত কাহিনীই, আমরা এ স্থানে অনূদিত করিয়া দিলাম।[২] তিনি লিখিতেছেন—"এমন ভয়ানক ঝড় ও সেই মহাঝটিকার রাত্রের ভয়ানক দৃশ্য, আমি জীবনেও ভুলিতে পারিব না। মুষলধারে বৃষ্টি, মুহুর্মুহু বজ্রনাদ, ঝড়ের বিষম ঝাপটা ও সন্‌সন্ শব্দ দেখিয়া, আমি উপরতলা হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম। আমার বিশ্বাস, যে বাড়িতে আমি বাস করিতাম, তাহা অন্যান্য সকল বাড়ি অপেক্ষা মজবুত। কিন্তু ঝড়-ঝাপটা, ও বাতাসের দমকা ইত্যাদি দেখিয়া আমার প্রতিমুহূর্তে ভয় হইতে লাগিল, যে বুঝি বাড়ি চাপা পড়িয়া আমাদের জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ হইতে হইবে। মিসেস ওয়াসটেল নামধেয় এক ইংরাজরমণী, আমাদের বাড়িতে পুত্রকন্যাদিসহ আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রাণের ভয়ে যে ঘরে ছিলেন—তাহার দরজা জানালা ও গৃহভিত্তি মহাশব্দে পড়িয়া গেল। এইভাবে ভয়, উদ্বেগ, অপঘাত মৃত্যুর আশঙ্কা লইয়া সমস্ত রাত্রিটা আমরা বসিয়া কাটাইলাম।"

"পরদিন প্রভাতে কি ভয়ানক দৃশ্যই দেখিলাম! পূর্বদিন সন্ধ্যায় ছোট বড়

১. গ্রন্থের প্রকাশনা কাল হইতে গণনানুসারে।

২. রাসেলের চিঠির তারিখ ১৭৩৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর।—H.E.A. Cotton's *Calcutta Old and New*, 2nd Ed. p. 27.

উনত্রিশ খানি জাহাজ, গঙ্গার উপর ছিল। আশ্চর্যের বিষয়, এই জাহাজের মধ্যে ডিউক অব ডর্সেট নামক (Duke of Dorsett) একখানি মাত্র জাহাজ নদীবক্ষে আছে। তাহারও অবস্থা অতি শোচনীয়। পাইল ও মাস্তুল ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এইখানি ছাড়া, অন্য জাহাজগুলির কয়েকখানি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছে, দুই চারিখানি তীরভূমিতে আড় হইয়া পড়িয়া আছে—অপরগুলি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গিয়াছে। কি ভয়ানক দৃশ্য! ইংরাজের ও দেশীয়দের আবাস বাটির মধ্যে, দশ-বারখানি একেবারে ভূমিসাৎ হইয়াছে। সেণ্ট এ্যান গির্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া গির্জাটা মাটিতে সমভূমি হইয়াছে। তখনকার অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—যেন কোন প্রবল শত্রু আসিয়া তাহা সমভূমি করিয়া গিয়াছে। এই ঝড়ের দ্বারা এত ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, যে লেখনীমুখে তাহার স্বরূপ বর্ণনা অসম্ভব। রাস্তার দুই ধারে যে সমস্ত বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল, তাহা রাস্তা জুড়িয়া পড়িয়া আছে।"

রাসেল লিখিত কাহিনী হইতেই প্রকাশ—এই ঝড় ৩০শে সেপ্টেম্বর আরম্ভ হয়। বঙ্গোপসাগর হইতেই ঝড়টা উঠিতে আরম্ভ করে। যেমন ঝড়ের বেগ, তেমনই মুষলধারে বৃষ্টি। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে নদীর জল ১৫ ইঞ্চি বাড়িয়া উঠে। ঝড়টা সমুদ্র হইতে উঠিয়া ৬০ লিগ পর্যন্ত দূরবর্তী স্থানে প্রভাবিত হয়। ইহার সঙ্গে আবার ভূমিকম্পও ছিল। প্রায় বিশহাজার জাহাজ, বোট, জেলেডিঙ্গী, নৌকা, ভড়, বজরা ইত্যাদি নষ্ট হইয়াছিল এবং ভাঙ্গিয়া বা ডুবিয়া গিয়াছিল। গো, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি অনেক গৃহপালিত পশু এই বন্যার মধ্যে ডুবিয়া যায়। এমন কি কলিকাতার জঙ্গলমধ্যবাসী কয়েকটি বাঘ ও গণ্ডারকে পর দিন নদী স্রোতে মৃতাবস্থায় ভাসিতে দেখা যায়। পক্ষিকুলের দুর্দশার ইয়ত্তা ছিল না। বহুসংখ্যক পক্ষীর মৃতদেহ, নদীজলে ও পথিমধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ৫০০ টন মাল বহিতে পারে, এমন অনেক জাহাজ দুইশত হাত দূরবর্তী গ্রামের মধ্যে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ডেকার, ডিভনশায়ার, নিউকাসেল প্রভৃতি তিন-খানি বড় বড় জাহাজ, নদীর তটভূমিতে ঝটিকা বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। পেলহ্যাম নামক জাহাজ খানির কোন সন্ধানই পাওয়া যায় নাই। ফরাসীদের একখানা জাহাজ পূর্বদিন রাত্রে বন্দরে আসিয়া লাগে—তাহাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

ঝড় থামিবার পর, নদীগর্ভে নিমজ্জিত অনেক মালপত্র পুনরুদ্ধার করা হয়।

একখানি জাহাজের অধিকাংশই জল মধ্যে নিমজ্জিত হইয়াছিল। তাহার মাল-গুলি উদ্ধারের জন্য একজন লোককে নীচের ডেকে নামাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সে ডেক হইতে বাহির হইয়া উপরে আসিল না। কোনরূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া, আর একজন লোক সেই ডেকের মধ্যে নামিয়া গেল। তাহারও সেই অবস্থা। তখন মশাল লইয়া, জনকয়েক লোক তাহাদের সন্ধানে নীচে নামিয়া গেল। তাহারা সেই মশালের আলোকে যে দৃশ্য দেখিল, তাহা অতি ভয়ানক। তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল—যে একটা প্রকাণ্ডকায় কুম্ভীর, সেই ডেকের জলে ভাসিয়া আছে। পূর্বগামী লোক তিন জনের যে কি অবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। কুম্ভীরটা জাহাজের গায়ে একটা গর্তের মধ্য দিয়া ডেকের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। অনেক চেষ্টা করিয়া কুম্ভীরটাকে বধ করা হইলে দেখা গেল—তাহার উদরের মধ্যে সেই তিনজন লোক রহিয়াছে।[১]

---

১. It is computed that 20000 ships, barks, sloops, boats canoes etc. have been washed away. A prodigious quantity of cattle of all sorts, a great many tigers and rhinoceroses were drowned and innumerable quantity of birds were sent down into the river by the storm. Two English ships of 500 tons were thrown into a village, about 20 fathoms from the bed to the river Ganges, broke to pieces and all the people drowned pell-mell....After the wind and water abated, they opened the hatches and took on several bales of merchandise & c. but the man who was in the hole to sling the bales, suddenly ceased working nor by calling him could they get any reply on which they sent down another, but heard nothing of him which very much added to their fear so that for sometime no one would venture down. At length one more hardy than the rest went down and became silent and inactive as the two former to the astonish-ment of all. They then agreed to look down into the hole by light which had a great quantity of water in it and to their great surprise they saw a huge alligator staring, as expecting more prey. It had come in through a hole in the shipside and it was with difficulty they killed it, when they found the three

পাঠক! সাঁইত্রিশ খ্রীস্টাব্দের (১৭৩৭) এই ভীষণ ঝটিকার ইতিবৃত্ত হইতেই বুঝিতে পারিবেন—এ ঝড় কিরূপ ভয়ানক! ইহাতে সেকালের নব-প্রতিষ্ঠিত কলিকাতার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিবৃত্ত হইতেই এই ঝড়ের কাহিনী আমরা লিপিবদ্ধ করিয়াছি। হইতে পারে, ইহার মধ্যে অতিরঞ্জিত কথাও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও, ইহা যে সেই সময়ে একটা মহা হুলুস্থূল উপস্থিত করিয়াছিল ও কলিকাতার অনেক নবনির্মিত বাড়ি ঘর ও চালা প্রভৃতি ভূমিসাৎ করিয়াছিল, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা স্থাপনের ৪৭ বৎসর পরে এই ঝড় হয়। এই অর্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া, যে সমস্ত বাড়ি ঘর নির্মিত হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই এই ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যায়।

জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতা প্রতিষ্ঠার পূর্বের ইতিহাস কিছুই নাই বলিলে হয়। প্রাচীন পুরাণ কাব্যাদিতে কলিকাতা, কালীঘাট প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সমস্ত সামান্য বর্ণনা আছে, তাহা হইতেই যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়। জোব চার্নকের পর হইতেই কলিকাতার নদীতীরবর্তী স্থানসমূহ অর্থাৎ সুতালুটি, হাটখোলা ও তন্নিকটবর্তী গোবিন্দপুর প্রভৃতির গভীর জঙ্গল ক্রমশ পরিষ্কৃত হয় ও তথায় লোকের বসবাস হইতে থাকে। অদ্ভুত প্রতিভাবলে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টি পরিচালিত হইয়া, জোব চার্নক ভবিষ্যৎবংশীয় ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মীকে এই সুতালুটিতেই প্রতিষ্ঠিত করেন। বর্তমান আসমুদ্রব্যাপী বৃটিশাধিকৃত ভারতবর্ষ তাঁহার এই দূরদর্শিতার ফল।

---

men in the alligator's belly. অন্য একমতে—"of nine English ships then in the Ganges eight were lost and most of the crews drowned. Barks of sixty tons were blown two leagues up into land over the tops of high trees....300000 souls are said to have perished. The water rose 40 feet higher than usual in the Ganges—" *Gentlemen's Magazine, 1738, Historical and Ecclesiastical Sketches of Bengal*, 1828, pp. 182-183, H.E.A. Cotton's *Calcutta Old and New*, 2nd Ed. pp. 27-29.

কলিকাতার ভূতত্ত্ব ও পুরাকালের কথা

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়

অতি প্রাচীন কালে বঙ্গদেশের অবস্থা। —রাজমহলের তল-দেশে সমুদ্রের তীরভূমি—মধ্যাদির সময়ে বঙ্গের অবস্থা—যুধিষ্ঠিরের সময়ে বঙ্গের অবস্থা—প্রাচীন তাম্রলিপ্ত—পরিব্রাজক হুয়েন্-সাং-এর কথিত কাহিনী—পৌণ্ড্র, কামরূপ, সমতট—তাম্রলিপ্ত, কর্ণসুবর্ণ প্রভৃতি বঙ্গের পঞ্চ-বিভাগ—বুদ্ধদেবের সময়ে বঙ্গের অবস্থা—রাজধানী রূপে গৌড়, রাজমহল, মুর্শিদাবাদ—বরাহ-মিহিরের গ্রন্থে উল্লিখিত সমতট-ভূমি—কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ—সে-কালের শৃগালদহ (শিয়ালদহ), বালুকা (বালী), খড়্গদহ (খড়দহ) প্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ—দক্ষিণ বঙ্গের সমুদ্র গর্ভে অবস্থান—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও চরের উৎপত্তি—শতাধিক বৎসর পূর্বে গড়ের মাঠের কেল্লায় ও শিয়ালদহে পুষ্করিণী খননের ফলাফল—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মত—কলিকাতা, কিলকিলা ও কালীক্ষেত্রের সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ভব।

জোব চার্নক কর্তৃক কলিকাতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিবার পূর্বে, আমরা কলিকাতার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিব। পাঠক হয়ত মনে করিতে পারেন, কলিকাতার আবার ভূতত্ত্ব কি? কিন্তু তাঁহারা আজকাল কলিকাতাকে যে অবস্থায় দেখিতেছেন, কলিকাতার ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা দেখিতেছেন, পুরাকালে সেরূপ ছিল না। আমরা এ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিব।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, বহুপূর্বে অর্থাৎ যখন এদেশের কোন ইতিহাসই ছিল না সেই প্রাচীনতম কালে, বর্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণ ভাগ সমুদ্র-গর্ভে নিমজ্জিত ছিল। আজ কালকার রাজমহল, মুর্শিদাবাদ ও মালদহের সীমার মধ্যে, কোন একস্থলে সমুদ্রতীর ছিল। হিমালয় হইতে বহির্গত সমস্ত নদ-নদী সেই পুরাকালে ঐ স্থানে আসিয়া সাগরে পড়িত। তাহাদের স্রোত-পরিচালিত বালুমৃত্তিকায়, গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপ বা ইংরাজ ভৌগোলিকগণের Gangetic Delta-র উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ অবস্থা হইতে ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া, দক্ষিণ বঙ্গে সমতল ভূভাগের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

শাস্ত্রাদি হইতে জানিতে পারা যায় যে, মনুর সময়ে কেবলমাত্র প্রয়াগ পর্যন্ত, হিন্দু আর্যদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে,

আর্যগণ ক্রমশঃ পূর্বদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মনু সংহিতায়[১] 'পৌণ্ড্র-দেশ'[২] পতিত ক্ষত্রিয়গণের আবাসভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পৌণ্ড্র দেশ উত্তর বাংলার প্রাচীন নাম। ইহা হইতে সপ্রমাণ হইতেছে, মনুর সময়ে উত্তর বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে আর্যদিগের করতলগত হয় নাই। বৈবস্বত মনুর পুত্র, প্রথিতযশা ইক্ষাকু নরপতি অযোধ্যার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ক্রমে চন্দ্র ও সূর্যবংশীয় নৃপতিগণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অসভ্য অনার্য জাতিদিগকে দূরীভূত করিয়া, আপনাদের অধিকার বিস্তৃত করিলে সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ এইসকল স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

মহাভারতে দক্ষিণ বাঙ্গালার অন্তর্গত 'তাম্রলিপ্ত' প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পাণ্ডুবংশধর রাজচক্রবর্তী সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সময়ে, রাজসূয় যজ্ঞকালে পূর্বদিক বিজেতা ভীমসেন ঐসমস্ত প্রদেশের অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) প্রভৃতি স্থানে সে সময়ে পাণ্ডবগণের প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিগণ রাজত্ব করিতেন। অধিকাংশ প্রাচীন পুরাণাদির দেশ-বিবরণ স্থানে, দক্ষিণ বাঙ্গালার সমুদ্রতীর পর্যন্ত অরণ্যানিপূর্ণ তাবৎ ভূভাগকে 'সমতট প্রদেশ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

চীন-দেশীয় ভ্রমণকারী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হুয়েন-সাং ভারতবর্ষের সমসাময়িক অবস্থার কথা তাঁহার লিখিত-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া সেই অন্ধতমসময় যুগের ইতিহাস-রক্ষার অনেক সহায়তা করিয়াছেন। হুয়েন-সাং যখন বাঙ্গালায় আসেন, তখন ইহা পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। তাঁহার মতে, তৎকালে বঙ্গের উত্তরে পৌণ্ড্র, উত্তর-পূর্বে কামরূপ, পূর্বে সমতট, দক্ষিণ পশ্চিমে তাম্রলিপ্ত ও পশ্চিমে কর্ণসুবর্ণ বিভাগ ছিল। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, যে, তাম্রলিপ্ত (বর্তমান মেদিনীপুর) হইতে দক্ষিণেশ্বর সমগ্র সমতটভূমি সম্পূর্ণরূপে জনশূন্য ছিল।

---

১. মনুসংহিতার রচনাকাল আনুমানিক খ্রী. পূ. ২০০ এবং খ্রীস্টাব্দ ২০০-এর মধ্যবর্তী কাল। প্রয়াগ পর্যন্ত আর্য উপনিবেশ এবং সভ্যতার বিস্তার ইহার পূর্ববর্তী কালে অর্থাৎ মহাভারতের যুগে ঘটিয়াছিল।

২. শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয় জাতয়ঃ / বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ।৪৩।

পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রাবিড়া কাম্বোজা যবনাশকাঃ।৪৪।—মনুসংহিতা, ১০ম অধ্যায়।

সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিত শিরোমণি ডাক্তার কনিংহাম বলেন, খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী হইতেই আমরা ভারতের নানা স্থানের ভৌগোলিক অবস্থা সম্বন্ধে নানা কথা জানিতে পারি। ইহার পূর্বের ঘটনা কুহেলিকা-জালে সমাবৃত। বুদ্ধদেবের সমসাময়িক লিখিত বিবরণের সহায়তায় ভারতের প্রাচীনতম স্থানের অনেক বিবরণ অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত কাহিনী হইতে আমরা দক্ষিণে রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতির কথা জানিতে পারি। আলেকজান্দার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন সেই সময়ে পাটলী-পুত্র বা পাটনার কথা জানিতে পারা যায়। জনকপুর, শ্রাবস্তী, কুশীনগর, কপিলাবস্তু প্রভৃতি নগরীগুলি, নেপাল তিরায়ের পর্বতশ্রেণীর অধিকৃত নিম্ন সমতল ভূভাগেই স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীস্টের ছয় হইতে দশম শতাব্দীর মধ্যে পাটনার দক্ষিণ প্রদেশ গুলির যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। ইহার কয়েক শতাব্দী পরে, আমরা গৌড় নগরীর নামোল্লেখ দেখিতে পাই। ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে গৌড়ের ধ্বংসের সহিত তাণ্ডায় বঙ্গের রাজধানী স্থাপিত হয়। তৎপরে ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে মুরশিদকুলি খাঁ মুরশিদাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। পণ্ডিতবর কনিংহামের মতে, সমস্ত বঙ্গদেশের এইরূপ উন্নত ও জনপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হইতে তিন চারি সহস্র বৎসর লাগিয়াছে।[১]

প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, আজকাল যে কলিকাতা 'সৌধময়ী নগরী' বা City of Palaces বলিয়া এত গৌরবান্বিত, সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে তাহার চিহ্নমাত্র ছিল না। সমুদ্রের অনন্ত সলিলগর্ভে বর্তমান কলিকাতার অধিকৃত ভূখণ্ড প্রোথিত ছিল। তাঁহাদের মতে পুরাকালে রাজমহলের নিম্নদেশ দিয়া বঙ্গোপসাগরের খরস্রোত প্রবাহিত হইত। বহুদিন ধরিয়া, ক্রমাগতঃ চড়া পড়িয়া আবার গাঙ্গেয় 'ব'-দ্বীপ, সমুদ্রগর্ভ হইতে ক্রমশঃ উত্থিত হইতে লাগিল। এই ব-দ্বীপ অতি পুরাকালে সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল।

সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিৎ-পণ্ডিত বরাহ-মিহির বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশকে 'সমতট' বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন পুরাণ উপপুরাণ কিম্বা অন্য প্রাচীন গ্রন্থে 'সমতটের' নামোল্লেখ পর্যন্ত নাই। সম্ভবত খ্রীস্টের সপ্তম শতাব্দী হইতেই 'সমতট' একটি ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়। বর্তমান কলিকাতা সেই সময়ে

---

১. *Journal of the Geological Society of London.* VOL XXI, 1869.

এই সমতটের দক্ষিণে বন জঙ্গল পরিপূর্ণ অবস্থায় সুন্দরবনের গর্ভে ছিল। জনশ্রুতি এই, উক্ত প্রাচীন জঙ্গলময় স্থান আর একবার ভূগর্ভে বসিয়া যায়। তৎপরে কাল সহকারে পলি পড়িয়া আবার উন্নত ভূভাগে পরিণত হইয়াছে।

কতদিন হইতে বর্তমান কলিকাতার অধিকৃত ভূভাগখণ্ড বাসযোগ্য হইয়াছে এবং কোন্ সময় হইতে এখানে জনমানবে প্রথম বসবাস করিতে আরম্ভ করে, তাহার প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা অতি কঠিন। সুন্দরবনের ন্যায়, এই প্রাসাদ-শোভাময়ী কলিকাতা, বহুপূর্বে গভীর জঙ্গলময় ও ব্যাঘ্রাদি শ্বাপদগণের বসবাস ছিল। বহু শতাব্দী পূর্বে নীচশ্রেণীর অসভ্য জাতিরা ক্রমশঃ ইহার জঙ্গল কাটাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তাহারা সম্ভবত শাস্ত্রোক্ত কিরাত, নিষাদ, শবর অথবা কোল জাতি। তাহাদের বসবাস হেতু, এই জঙ্গল-পূর্ণস্থান ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হয়। তৎপরে এক শ্রেণীর অসভ্যজাতি এখানে আসিয়া বাস করে। তাহারা নদী হইতে মাছ ধরিয়া বা চাষ-বাস করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিত। ইহাই কলিকাতার বহু শতাব্দীপূর্বের আনুমানিক ইতিহাস। উপরে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি তৎসম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোন লিখিত বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন পুরাণাদির উক্তি, অনুমান ও চলিত কিম্বদন্তী হইতেই সেই অন্ধকারময় যুগের প্রাচীন বিবরণ কিছু সংগৃহীত হইতে পারে। ভবিষ্যতে কালীঘাটের কথা বলিবার সময়ে আমরা এ সম্বন্ধে আরও কিছু বলিব।

পণ্ডিতবর পদ্মনাথ ঘোষাল বলেন, "অতি প্রাচীন কাল হইতেই কলিকাতা সর্ব সাধারণে পরিচিত। পুরাকালের হিন্দুগণ, এই স্থানকে—'কালীক্ষেত্র' বলিতেন। তৎকালের এই কালীক্ষেত্র বহুলা হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অনেকে এই বহুলাকে বর্তমান কালের 'বেহালা' বলিয়া অনুমান করেন। এই 'কালীক্ষেত্রের' সীমার মধ্যে কোন একটি স্থলে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া সতীদেহের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। এই জন্য, সেই স্থানে এক দেবীমূর্তি ও একটি ভৈরব-মূর্তির প্রতিষ্ঠা হয়। ভৈরবের নাম নকুলেশ্বর আর দেবীমূর্তি কালী। অনেকের মতে এই কালীক্ষেত্র হইতেই কলিকাতা নাম হইয়াছে, এবং কালী-ক্ষেত্র ও কালীঘাট যে বিভিন্ন স্থান, এসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। গৌড়েশ্বর বল্লাল সেনের সময়ে 'কালীক্ষেত্র' স্থানটি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। বল্লালের এক দান পত্র হইতে জানা যায় যে, তিনি 'কালীক্ষেত্র' নামক এই

বিস্তৃত ভূভাগটি এক ব্রাহ্মণকে দান-পত্র লিখিয়া দান করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই 'কালীক্ষেত্রের' আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না।

'দিগ্বিজয়প্রকাশ' বলিয়া একখানি সংস্কৃত ভূগোল ও ইতিহাস আছে। এই বহুমূল্য গ্রন্থখানি সেকালের একজন প্রাচীন কবি, কবিরামের রচিত। কবিরাম[১] মগধ বা আধুনিক বিহারের কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। কবিরামের গ্রন্থে 'কিল্‌কিলা' বলিয়া একটি স্থানের বিবরণ[২] আছে। এই বিবরণ হইতে জানা যায়, কিল্‌কিলা একটি বিস্তৃত ভূভাগ ছিল ও তাহার সীমার মধ্যে অনেক বড় বড় নগর ও গ্রাম ছিল। কবিরাম সম্ভবত স্বনামপ্রসিদ্ধ, যশোরেশ্বর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। আমরা নিম্নে কবিরামের 'কিল্‌কিলার' সম্বন্ধে লিখিত বিবরণটি বিশ্বকোষ মহাভিধান হইতে সংগ্রহ করিয়া দিলাম। স্থানাভাব জন্য মূলভাগ পরিত্যক্ত হইল।

'পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্বে গঙ্গানদী ইহার মধ্যে একুশ যোজন পরিমিত কিল্‌কিলা-ভূমি। ইহা দুইভাগে বিভক্ত। দানগলী নদীর পশ্চিমে, গঙ্গার নিকটে শাড়েশ্বরী দেবী বিরাজ করিতেছেন। এখানে উপবাস করিলে কুষ্ঠাদি দারুণ রোগ দেবীর কৃপার আরোগ্য হয়। মাহেশ ও খড়্গদহ (খড়দহ) গ্রামের মধ্যে, দীর্ঘ-গঙ্গার নিকট ফুলপাল নামক রাজা বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গা-নদীর তটে অনূদেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বার্তাভূমি (?) আছে। এখানে কদলী, পুন্নিপর্ণী, সুপারি প্রভৃতি গাছ জন্মে। পীঠমালা মতে, এখানে ভাগীরথী তীরে সতীদেবীর শরীর হইতে বামহস্তের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কালিকা-দেবীর প্রসাদে কিল্‌কিলা বাসীরা ধনধান্যবান হইবেন। সকল প্রকার শস্যাদি জন্মে বলিয়া ইহাকে 'ঋদ্ধ' দেশ বলিয়া থাকে। এখানে সকল বর্ণের লোক নিয়ত বাস করে। এখানকার দেশবাসীদের মতে, সমুদ্র মন্থনকালে,

১. করিরাম, পাটলীপুত্র নগরবাসী একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক। পাটলীপুত্র হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আনাম দেশ পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি যে সমস্ত দেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত 'দিগ্বিজয়-প্রকাশে' লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

২. দিগ্বিজয়প্রকাশে কিলকিলা (কিলকিল্লা) বর্ণণা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে যে ইহার পূর্বসীমা কালিন্দিকা (অর্থাৎ যমুনা) নদী, পশ্চিমদিকে সরস্বতী।

পৃষ্ঠস্থিত মন্দার-পর্বতের ও অনন্তের ভারে অভিভূত হইয়া, পর্বত-ভারবাহী কূর্ম দৈত্যগণের মোহনের জন্য এক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন। সেই নিশ্বাসের কল্লোল যতদূর গিয়াছিল, ততদূর 'কিল্‌কিলা-দেশ'। সতী-দেবীর বরে, মহাবলমান কুলপাল ও দেশপাল, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। কুলপালের দুই পুত্র। হরিপাল ও অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে[১] নিজনামে হট্টপাদীযুক্ত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তাঁতি, গোষ্ঠী ও সাঙ্গাইদিগের রাজা হইলেন। অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণীর নিকট চক্রদ্বীপ (চাকদা) ও ডুমুরদীপ (ডুমুরদ) গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অহিপালের তিনপুত্র। কৃতধ্বজ বিভাণ্ড ও মহাবল কেশীধ্বজ। কেশীধ্বজ কিল্‌কিলার পশ্চিমে যোজনান্তরে (?) সপ্তগ্রাম মধ্যে রাজা হইয়া বেঘ (?) জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন। কৃতধ্বজের পুত্র মহাবল বিরলী সুগন্ধি নামক গ্রামে বসবাস করেন। বিভাণ্ড পূর্বপারে বাণরাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা, জগদ্দলে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য, ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের রাজা হইয়াছেন। রাজা কেশীধ্বজ, চান্দোল নামক স্থানে নানাস্থান হইতে কায়স্থ আনাইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখন ব্রাহ্মীনদীর তীরে সেই কেশীধ্বজের বংশোদ্ভব কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছেন। শিবপুর ও বালুকা (বালি) গ্রামের মধ্যে এবং ভদ্রেশ্বরের নিকট শ্রীরামপুরাদি গ্রামে, ব্রাহ্মণ জাতির বাস। হুগলীর নিকট বংশবাটি (বাঁশবেড়িয়া) প্রভৃতি গ্রাম। এখানে খলাপি নদী দামোদর হইতে আদি-গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। খলসানি গ্রামে ধীবর রাজার রাজত্ব। এখানে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যে পাটুলী গ্রাম কায়স্থ অধিবাসীদের অধীন। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্টপল্লী, কালীদেবীর নিকটস্থ শৃগালদহ (শিয়ালদহ) এবং সারপল্লীও কায়স্থদিগের শাসনে আছে। সর্বশুদ্ধ তিন হাজার গ্রাম কিল্‌কিলার অন্তর্গত। '…' বিশ্বসার-তন্ত্রের প্রথম পটলে, কিল্‌-কিলাস্থ শিবলিঙ্গের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। উক্ত তন্ত্র মতে কিল্‌-কিলাদেশে নবদ্বীপ নগরে ব্রাহ্মণবংশে শচীসুত (চৈতন্যদেব) এবং খড়্গদহ গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবেন।'[২]

১. এখনও তারকেশ্বর লাইনে হরিপাল গ্রাম বর্তমান।

২. কবিরাম যে সমস্ত গ্রামের ও ভূভাগের নামোল্লেখ করিয়াছেন—তাহাদের অনেকগুলি পরিবর্তিত নাম লইয়া, এখনও বিরাজমান। তাঁহার উল্লিখিত

'দিগ্বিজয়প্রকাশ' হইতে আমরা জানিতে পারি, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আমলে খড়্গ-দাহ (খড়দা) মাহেশ, হরিপাল, সিঙ্গুর, ত্রিবেণী, চাকদা, ডুমুরদা, সপ্তগ্রাম, জগদ্দল, শিবপুর, বালী, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, বাঁশবেড়িয়া, খলসানি, গোবিন্দপুর, ভাটপাড়া, শিয়ালদহ প্রভৃতি স্থান উল্লেখযোগ্য অবস্থায় ছিল।

ইতিপূর্বে আমরা যাহা কিছু বলিয়াছি তাহা হইতে প্রমাণ হয়, যে সমুদ্রগর্ভ হইতেই কলিকাতার উৎপত্তি। পূর্বোক্ত কিল্‌কিলা প্রদেশের অধিকাংশ স্থান বাদাভূমি ও সমুদ্র-গর্ভজাত ক্ষুদ্র-বৃহৎ দ্বীপাদি পূর্ণ ছিল। এখনও নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, সুখ-সাগর, চাকদহ, ডুমুরদহ, খড়দহ, আর্যদহ, (আরিয়াদহ বা এঁড়েদা) প্রভৃতি নাম হইতে প্রমাণ হয়, এ স্থানগুলি সমুদ্র বেষ্টিত খাড়ী, নদীগর্ভ বা জলাভূমি হইতে উদ্ভূত। পণ্ডিতপ্রবর ফরগুসান সাহেব বলেন, 'দহ' শব্দটি দ্বীপের অপভ্রংশ।

বর্তমান কালে, কলিকাতার ভূতত্ত্ব-সম্বন্ধে কয়েকটি পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। সে পরীক্ষার ফল হইতেও প্রমাণ হয়, যে বর্তমানকালের কলিকাতা ও তাহার সন্নিকটস্থ স্থানগুলি বহুশতাব্দী পূর্বে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। কেহ কেহ বলেন, হিমাচলের ত্রিশ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রতরঙ্গ উত্থিত হইত। কালে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূমিখণ্ড ঊর্ধ্বোত্থিত হইয়া উত্তর বাঙ্গালার উৎপত্তি হইয়াছে। উত্তর বাঙ্গালার যে কোন স্থানের ভূমি খনন করিলেই এখনও গন্ধক এবং জারিত লৌহ (Vetrified Iron) যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এইজন্য অনেক স্থানের মৃত্তিকা দেখিতে যেন এক নম্বর সুরকীর মত লোহিতবর্ণ। এই লৌহে উৎকৃষ্ট অসি প্রস্তুত হইত। 'লৌহার্ণব' গ্রন্থে লিখিত আছে—"বঙ্গ-দেশজাত অসি তীক্ষ্ণ ও ছেদ-ভেদে পটু।" কুচবিহারের নিম্নে, প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ লৌহ আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, অগ্ন্যুৎপাতে উৎপন্ন দ্বীপ সমূহের উপর হিমালয়-জাত নদী সমূহ অবিশ্রান্ত কর্দমরাশি সহ, নুড়ী-প্রস্তর আনিয়া ঢালিতে ঢালিতে, বহু সহস্র বৎসরের চেষ্টায়, হিমালয়কে বর্তমান স্থানে রাখিয়া আসিয়াছে। কয়েক বৎসর পূর্বে, ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কলিকাতার মধ্যবর্তী ভূমি গভীর ভাবে খনন করিয়া ইহার প্রাচীন অবস্থার অনেক প্রমাণ পাইয়াছেন। এই সমস্ত খনিত

রাজ্য ও রাজাগণের কোন ইতিহাসই পাওয়া যায় না। বল্লালী আমলের 'কালী-ক্ষেত্র' ও কবিরামের উল্লিখিত কিল্‌কিলা যে অবশ্য বর্তমান কালীঘাট নহে—ইহা উল্লিখিত বিবরণ হইতেই প্রমাণ হয়। —নব্যভারত ১৩০৮।

স্থানে বসবাসের চিহ্নস্বরূপ, দগ্ধ মৃত্তিকা বা ধাতুদ্রব্যের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল। অনেক স্থলে, কেবল উদ্ভিজ্জ-সার ও নদীর বালুকা স্তরই দেখা দিয়াছিল। লালদীঘি, মনোহর-তালাও প্রভৃতি পুষ্করিণী খনন কালে, এরূপ অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। কলিকাতার গড়ের মাঠের মধ্যে, ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি পুষ্করিণী খনন করান হয়। উক্ত বৎসরের মে মাসেই 'কলিকাতা গেজেটে' ইহার রিপোর্ট বাহির হইয়াছিল। উক্ত রিপোর্ট হইতে জানা যায়, চৌরঙ্গীর কোণে দীঘির নিম্নে বালুকা জন্মায়, গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণীটি শুকাইয়া যায়। সেই জন্য উহাকে একটু বেশী গভীর করিয়া খনন করান হয়। খননকালে চারি ফিট নিম্নে, সারি সারি পুরাতন বৃক্ষের মূল পাওয়া গিয়াছে। উদ্ভিদতত্ত্ববিৎ-পণ্ডিতগণ, সে মূলগুলি সুন্দরী-বৃক্ষের বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ইহার আরও কয়েকটি স্থানে পুষ্করিণী খননকালে, ঐ প্রকার চিহ্ন দেখা যায়। সরকারী-রিপোর্ট হইতে আমরা তাহার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিলাম।—

১। শিয়ালদহ ষ্টেশনের দক্ষিণে যে পুষ্করিণী আছে, তাহা খননকালে প্রথম স্তরের একফুট মৃত্তিকার নিম্নে, তিন ফিট পরিষ্কার নদীর বালুকা, তৎপরে কোন কোন স্থানে ছয় ফিট, আবার কোথাও বা আট ফিট সূক্ষ্ম বালুকাসহ, উদ্ভিজ্জ-সার ও ঝিনুক পাওয়া গিয়াছে। তৎপরে পরীক্ষার জন্য আরও গভীর করিয়া খনন করিলে এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণের আটাল মৃত্তিকা পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মৃত্তিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবামাত্রই, ছাই হইয়া যায়। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদের মতে, ইহা 'পিট-কোল' বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছিল। ঐ পুষ্করিণীটি আরও গভীর করিয়া খনন করায়, সারি সারি সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি সকল পাওয়া যায়।

২। এই সময়ে কলিকাতার বর্তমান কেল্লার মধ্যে, একটী কূপ খনন করান হয়। তাহাতেও শিয়ালদহের পুষ্করিণীর ন্যায়, মাটি ও বালি পাওয়া যায়। শেষ ১৫৯ ফিট খনন করিবার পর হরিদ্রাবর্ণ সূত্র-চিহ্ন-বিশিষ্ট আঁটাল মাটি পাওয়া যায়। ১৮০ ফিট নিম্নে, পিটকোলের সহিত ছাঁচিকুমড়ার বিচি ও ইক্ষু পত্র পাওয়া গিয়াছে। ১৯৬ ফিটের নিম্নে লৌহসংযুক্ত মৃত্তিকার চিহ্ন পাওয়া যায়। ৩৫০ ফিট নিম্নে, একটি কুক্কুরের কঙ্কাল ও ৩৭২ ফিটের পর একটি কচ্ছপের খোলা বাহির হইয়াছিল। ইহার পর আরও খনন করিতে করিতে ঝিনুক, গলিত উদ্ভিজ্জ-সার ও গাছের গুঁড়ি দেখা গিয়াছিল।

এইরূপ পদার্থসমূহের আবির্ভাব দেখিয়া, কূপটিকে ৪৮১ ফিট পর্যন্ত খনন

করান হয়। কিন্তু তাহার মধ্যে সমুদ্রতীরের ক্ষুদ্র বালুকা, পর্বত নিঃসৃত ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড, অভ্রের খণ্ড বাহির হওয়ায় খননকার্য বন্ধ করা হয়।

৩। কয়েক বৎসর গত হইল, দমদমার নিকট একটি পুষ্করিণী খননকালে গভীর ভাবে খনিত একটি স্থান হইতে ঐরূপ বৃক্ষ একটি হরিণের শৃঙ্গ বা কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল।

৪। বর্তমান গার্ডেনরীচের নিকট এক পুষ্করিণী খননে একখানি নৌকা বাহির হয়। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, গঙ্গার বদ্বীপ বা (Gangetic Delta) বহুবার বসিয়া গিয়া, এক্ষণে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ৬৩৫ খ্রীস্টাব্দে, চীন পরিব্রাজক হুয়েন-সাং, তমলুক বা তাম্রলিপ্ত নগরীকে সমুদ্র তটে দর্শন করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তমলুক হইতে সাগর ৬০ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। ধরিতে গেলে, প্রতি শতাব্দীতে প্রায় পাঁচ মাইল করিয়া ভূমি ভরিয়া উঠিতেছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায়, বরাহ মিহিরের 'সমতট' ও কবি-রামের 'কিল্‌কিলা' প্রদেশ বহু বহু শতাব্দীর অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে।

বঙ্গদেশের প্রাচীন কালের কোন ধারাবাহিক লিখিত বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য এত বেশী, বহু শতাব্দী পূর্বের কথা দূরে থাক, একশত বৎসরের পূর্বের ঘটনারও কোন লিখিত বিবরণ নাই। এরূপ অবস্থায় বঙ্গদেশের প্রাচীন ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া অতি দুর্ঘট ব্যাপার।

মোটের উপর কথা হইতেছে এই, বর্তমান কলিকাতা নগরীর অধিকৃত স্থান ও সমগ্র দক্ষিণ বঙ্গ অতি পুরাকালে সমুদ্র-গর্ভমধ্যে নিমজ্জিত ছিল। চর ও বালুকাস্তর দ্বারা কালধর্মে, গভীর সমুদ্রতল হইতে যুগ যুগান্তর ধরিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডের অস্তিত্ব জন্মিয়াছে। এই সমুদ্র-গর্ভোত্থিত দক্ষিণ বঙ্গের মধ্যেই কলিকাতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

B I V A V

Price : Rs. 10·00 | 47th Issue | Reg. No.
Vol. 13. No. 1 | October – December 89 | R. N. No. 30017/76

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL No. ISSN 0970 – 1885

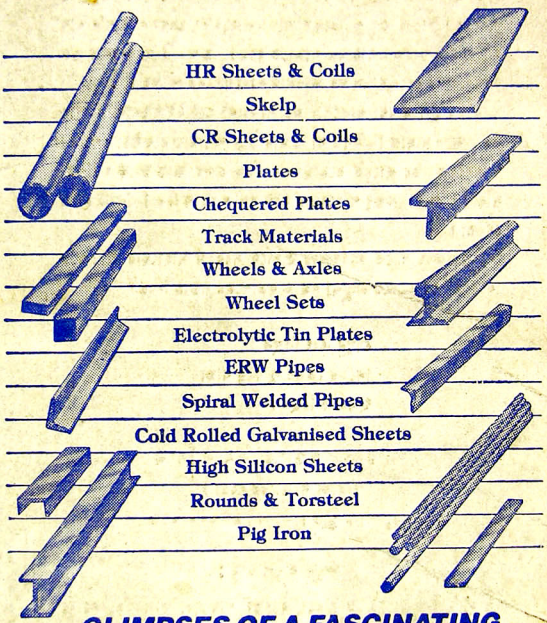

...GLIMPSES OF A FASCINATING PRODUCT PANORAMA

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED
CENTRAL MARKETING ORGANISATION
10 Camac Street, Calcutta 700017

CONTAD/BAL/85-7